KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলি- ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher [illegible]
Title [illegible]	Size 7"x9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫১/৯ ৫১/১০ ৫১/১১ ৫১/১২	Year of Publication পৌষ ১৩৯৭ ॥ Jan 1991 মাঘ ১৩৯৭ ॥ Feb 1991 ফাল্গুন ১৩৯৭ ॥ March 1991 চৈত্র ১৩৯৭ ॥ April 1991
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

ব্যক্তিমানস সংগঠিত হওয়ার পদ্ধতিতে ধর্মের স্থান কি-রকম? কিভাবে কোথায় ধর্ম কথাটির সংজ্ঞা গৃহীত হয়েছে? ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে মানবজীবন পরিচালনাকে ধর্ম কিভাবে প্রভাবিত করে? এইসব প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর সন্ধানে এযাবৎ লব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের বিচিত্র শাখায় অনায়াস পরিক্রমা চালিয়ে ড· অরুণা হালদার লিখেছেন, "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা"।

ভারত-ইতিহাসে টিপু সুলতানের ভূমিকা কী? তিনি কি ধর্মান্ধ কিংবা সাম্প্রদায়িক ছিলেন? এইসব সংশয়ের নিরসনকল্পে সাম্প্রতিকতম গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী পরিবেশিত হয়েছে ড· গৌতম নিয়োগীর নিবন্ধে।

ইউনিফর্ম সিভিলকোড চাওয়াটাই কি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ? এই প্রশ্নের মনোজ্ঞ আলোচনাসহ 'ধার্মিক' অথচ 'ধর্মনিরপেক্ষ' সদ্যপ্রয়াত বিচারপতি মাসুদকে নিয়ে গৌরী আইয়ুবের স্মৃতিচারণ।

রেনেসাঁস এবং রামমোহনকে নিয়ে মার্কসবাদী মূল্যায়নের দাবিদার একটি গ্রন্থের তর্কসাপেক্ষ তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনা।

বাঙলার বাউল বিষয়ে একখানি বাণিজ্যিক ইংরাজি বই নিয়ে লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ সুধীর চক্রবর্তীর আলোচনা।

এবারের জাতীয় নাট্যমেলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা "এত ভঙ্গ তবু রঙ্গে ভরা"।

***

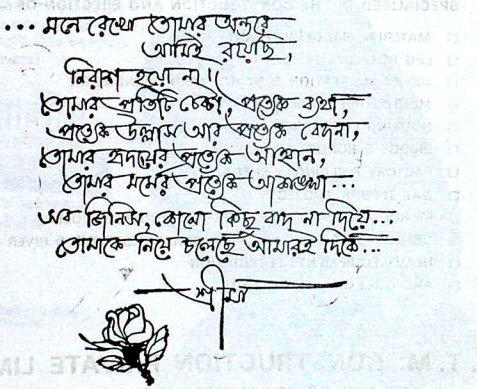

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ১০
ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
মাঘ ১৩৯৭

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা অরুণা হালদার ৭৫৯
ভারত-ইতিহাসে টিপু সুলতান গৌতম নিয়োগী ৭৮৪

আমাদের গল্প প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৭৭৯
প্রখর তপনতাপে পরিমল চক্রবর্তী ৭৮০
পাহাড়ে, নদীকূলে, অ-সভ্যতায় দাউদ হায়দার ৭৮১
ছোঁয়া মতি মুখোপাধ্যায় ৭৮৩

মদনাদীঘির বৃত্তা অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ৭৯৭

স্মরণে ৮০৭
সৈয়দ সাদত আবুল মাহুদ গৌরী আইয়ুব

গ্রন্থসমালোচনা ৮১৪
সুধীর চক্রবর্তী, কামাল হোসেন, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

নাটক ৮৩৫
এত ভঙ্গ তবু রঙ্গে ভরা অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

"প্রজাতন্ত্র
দিবসের
শপথ"

স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পরেও
আমাদের দেশের তেষট্টি শতাংশ মানুষ
আজও নিরক্ষর।

এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে
নিরক্ষরতার অন্ধকারে রেখে
আমাদের প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন
কখনোই সফল হতে পারে না।

প্রজাতন্ত্র দিবসে
আসুন দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার
শপথ গ্রহণ করি।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

ICA 407

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা

অরুণা হালদার

ভূমিকা (অবতরণিকা)

আলোচ্য প্রবন্ধটির বিষয়গৌরবে ও সময়ৌচিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে মনে করি। তাহলেও নিজের দিক থেকে লেখক হিসাবে ত্রুটি স্বীকার করা একান্ত কর্তব্য বিবেচনা করি। বিষয়নির্বাচন ও বিবেচন দুটিই বড়ো কঠিন। সমস্ত বিষয়টির ব্যাপকতা ও গভীরতা—দুটিই সীমাহীন বলে আপাতত মনে হচ্ছে। নিজের সীমিত শক্তি সম্বন্ধেও আমি সচেতন, তথা লেখকের দায়িত্ব সম্বন্ধেও। তা সত্ত্বেও আমার পরিশ্রম সার্থক হবে যদি কিছু সজ্জন ও আন্তরিকতা-প্রণোদিত ব্যক্তি সমাজ-জীবনের এই সময়য়ী তথা রক্তক্ষয়ী দিকটার কথা চিন্তা করেন। স্বীকার করতেই হবে—এ লেখা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত এবং শিক্ষিতম্মন্য মানুষের চোখেই পড়বে। তাতে করে বর্তমানের জাগ্রত জনজীবনের সমস্যারও লাঘব হবে বলে মনে করি না। তাহলেও মনে করি, ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার একটা প্রয়োজন আছে, এবং এ লেখা সেই প্রয়োজন-প্রণোদিত। তদ্ব্যতীত এ রচনা লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে—কে-বা পড়বেন বা কে ছাপবেন! আশ্চর্য এই যে, কিছু সদিচ্ছাগ্রস্ত মানুষও দেখা যায়, যাঁরা এই বিষয়টা আজকের দিনে মাথার মধ্যে রেখেছেন বা হৃদয়ের মধ্যে একটা গুরুভার অনুভব করেছেন। সুতরাং লেখাটা প্রকাশের দায়িত্বও কিছু লোক অনুভব করেছেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এর পরের কথা হল বিষয়প্রবেশ।

উপাদান: আমরা জানি, আজকের দিনে যে-কোনো বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে তার একটা বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনার প্রয়োজন হয়। শুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক পদ্ধতি খুব স্পষ্ট। সেজন্য সেক্ষেত্রে খুব বেশি করে পদ্ধতি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে—তাও আবার সে প্রবন্ধ যদি ধর্মবিষয়ক হয়—তার প্রয়োগপদ্ধতি ব্যাখ্যা করা খুব শক্ত এবং প্রায় দুরূহ। দুরূহ এইজন্য যে ব্যাপারটা কাল্পনিক নয় অথবা শুধুমাত্র তা সাহিত্যও নয়।

'উহ' কথাটার নির্গলিতার্থ এখন আমরা হাইপথিসিস বলে ধরি। বিজ্ঞানে এই হাইপথিসিস-এর পরিপোষক তথ্য মিলে যায়। নিরীক্ষণ আর পরীক্ষণ দ্বারা সেইসব তথ্যকে একটা নিয়মের মধ্যে আনা এবং সেইমতো ছকটা বদল করা বা নূতন করে সাজানো সম্ভব হতে পারে। "ধর্ম" বিষয়ক তথ্যকে সেভাবে সাজানো বা তজ্জাতীয় ছকের রদবদল করা সম্ভব না। এখানে আমরা গ্রহণ করি ব্যাক অ্যানালিসিস পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকুই

বিবেচনা আমরা করতে চেষ্টা করি। তা সত্ত্বেও অতি প্রসঙ্গ (too wide) বা প্রসঙ্গচ্যুতির (ডেভিয়েশন) দোষ ঘটা অসম্ভব নয়। সে ত্রুটি কিছু ঘটতে পারে আমার সীমিত জ্ঞানের জন্য, এবং কতকটা হওয়া সম্ভব বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্য। সর্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধার কারণ হল—বিজ্ঞান ও ধর্ম দুটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ভিন্নতা। বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর প্রধানত। তার দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তিনির্ভর এবং একাংশ হচ্ছে ইনটুইশন বা আরূপ্যগত (অ্যাবস্ট্রাকশন) জ্ঞান-নির্ভর। অপর পক্ষে, ধর্মের বিষয়বস্তুর উৎস যুক্তিগ্রাহ্য নয়, বরঞ্চ প্রায় সর্বাংশে তা কল্পনানির্ভর। এই কল্পনা-নির্ভরতাকে যুক্তিসহ অথবা যুক্তিগ্রাহ্য করা কঠিন কাজ বলেই মনে করি। তা সত্ত্বেও কয়েকটি যুক্তি-প্রমাণসহ বিষয়টি উপস্থাপন করার প্রয়াস করছি। এর জন্য আমাকে কয়েকটি চার্ট-এর সাহায্য নিতে হয়েছে। চার্টগুলির উৎস বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখায় ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং সংস্কৃতিমূলক আর্থ-সামাজিক ছকও, যা ইয়োরোপীয় ইতিহাসপদ্ধতির কাছাকাছি। কিন্তু উৎস থেকে উপাদান নিয়ে আমার নিজস্ব পদ্ধতিগত প্রণালীতে বা মেথডলজিতে তার প্রয়োগ-পরীক্ষা আমার কৃত। এই দায়িত্বের অকৃত্তিত্ব (বেশি সম্ভাবনা) আর কৃতিত্ব—দুইই আমার। তবুও সে প্রয়াসে যদি পাঠকের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শায়, সেটাই আমার পুরস্কার মানব। চারটি চার্টের প্রথম তিনটির উপাদান আর বিন্যাসের জন্য আমি সহায়তা নিয়েছি সাইকলজি, সোশ্যাল সাইকলজি, কালচারাল অ্যানথ্রপলজি, সোশ্যাল অ্যানথ্রপলজি এবং রিলি-জিয়স অ্যানথ্রপলজির। তৎসহ যুক্ত হয়েছে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের পর্ব বা সূত্রবিন্যাস। তৃতীয় চার্টটি অনাদি ও অনন্ত পারম্পর্যের একটি ঢেউয়ের মতো বিন্যস্ত করেছি—তাতে গ্রথিত আছে মানবসমাজের ইতিহাস ও সেই স্তরে ধর্মের উদয়।

পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে বিবেচনা করার চেষ্টা করেছি: ব্যক্তিজীবন তথা ব্যক্তিমননের মধ্য দিয়ে কী ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের জয়যাত্রা সূচিত হয়, এবং অপর-দিকে ব্যক্তি মনন কী ভাবে বহির্জগৎ থেকে ব্যক্তি-মানসের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় অনুভূতির উপাদান সংগ্রহ করে। প্রথম দুটি চার্টে সেই প্রণালী লক্ষ করা যাবে। তৃতীয় চার্টটিতে ব্যক্তিজীবনের প্রগতিপরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত আর্থসামাজিক ক্রমবিকাশের ধারাপথটি চিহ্নিত হয়েছে। সেই পারম্পর্যে গ্রথিত হয়েছে—ধর্মীয় উপাদান তথা ধর্মীয় অভিব্যক্তিরও একটা বিকাশ-ধারা। এখানে দেখা যায়—আদিতে ধর্মবোধ ছিল না, আবার বিজ্ঞান ও যুক্তির শেষ পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে ধর্মসংস্থাপনার ব্যাপারটি সংশয়িত। তবুও তা আছে এবং আপাতত থাকছে সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যগামী কোনো স্রোতের মতো। তার সঙ্গে অর্থাৎ ধর্মানুভূতির চেতনার সাথে যুক্ত হচ্ছে ধর্মদেশনা বা উপদেশ। ধর্ম শব্দটির অর্থসঙ্গতি বদল হচ্ছে। ধর্ম থেকে আসছে সাহিত্য এবং রাজনৈতিক আলোড়ন-আন্দোলনও। এই চার্টটির ক্ষেত্রে আমি সাধারণভাবে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের স্তরগুলি গ্রহণ করেছি—তার সঙ্গে যুক্ত করেছি আধুনিক বিজ্ঞানের অনন্ত জয়যাত্রার পথ যাকে আজ চিহ্নিত করা হয় ফিউচারিজম বলে—এই ফিউচারোলজির স্তম্ভগুলি বর্তমানে স্ট্যাটিসটিক্স-প্রাপ্ত ডেটানির্ভর। সেইহেতু বিজ্ঞানও অশেষ, ফিউ-চারও অনির্ণেয়। আপাতত মানবপ্রজাতিতে সকল সমস্যা আর সমাধানও তাই একটা ক্ষণকাল না হলেও খণ্ডকালের ও অবশ্যই পরিবর্তমান খণ্ডদেশের পক্ষে সীমাবদ্ধ। এই সীমিত নির্ধারণ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষেও তাই প্রযুক্ত ও প্রযোজ্য। ধর্ম শব্দটার সংজ্ঞা মানবপ্রজাতির মধ্যে কী ভাবে জন্মলাভ করেছে, ঘনীভূত ও স্তরীভূত হয়েছে, সেই ইতিহাস মানবসমাজের আর্থসাংস্কৃতিক বিকাশ ও বিবর্তনের ধারায় যেভাবে বিধৃত হয়েছে, তার একটা বিবরণ দেবার ঠিকমতো প্রয়াস এ প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। এও বলা প্রয়োজন যে পূর্বোল্লিখিত বিবরণানুসারে এটুকু বলা আবশ্যক যে শুধুমাত্র নানাবিধ ভৌত

বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে উক্ত ধর্ম কথাটার বিচার-বিবেচনা সম্ভব নয়। মানবীয় অনুভূতিগুলি মনো-বিদ্যানুযায়ী বিচারে একটা পূর্ণকায় (টোটাল) অনুভব। তার বিস্তার (এক্সটেনশন) আর গভীরতা (ডেপথ) আছে, তার উত্থান (একসাইটমেনট) আর নিরাস (নামনেস)—এ দুইও আছে। মনোবিদ্যা এগুলির স্পষ্টীকরণে আমাদের বিশেষ সহায়ক।

পদ্ধতি প্রকরণ : আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার জন্য বিজ্ঞান, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রমা, কলা বা পদ্ধতিগত প্রয়োগ—এসব শব্দ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ব্যবহারকালে মানবীয় অনুভবের বিচারে উক্ত বিভেদ-গুলির সীমারেখা টেনে রাখা যায় না। মানবপ্রকৃতির টোটালিটির মধ্যেই বিশ্লেষণ তথা সংশ্লেষণ বর্তমান। H_2O ফরমুলা আমরা বুঝি—জলের উপাদান এ দুটিকে উক্ত প্রোপরশনে মিলিয়ে কেন বা কী করে আমরা সিনথিসিস হিসাবে জল পাই—এটার বোধ বোঝানো যায় না। শুধু মেনে নিতে হয়। জিরো (0) কথাটা শূন্যগর্ভ নয়—এটা বোঝা, অথবা 2+2 =4—এই সহজ সত্যগুলির বোধোদয় একপ্রকার সিনথিসিস ছাড়া বোঝানোর উপায় আমাদের হাতে এখনও নেই। যতদূর ভাবতে পারা যায়—মনে হয়, ভবিষ্যতের ভাষা হবে গণিত। কিন্তু এই ভাবনা এখনও পরিস্ফুট হয় নি, কার্যগত হয় নি। সেজন্য একটা আনুমানিক ধারাবাহিকতা বা ইতিহাসকেও আমরা আলোচ্য বিষয়ের সহায়ক উপায় বলে গ্রহণ করেছি। তৃতীয় চার্ট এবং চতুর্থ চার্ট এ বিষয়ে পরিপূরকের কাজ করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাসের স্বাক্ষরে শুধু ডেটাগুলি বা কালসীমা-গুলিও আনুমানিক আর ফাংশনাল বলে ধার্য। কারণ স্বভাবতই এগুলির পরিবর্তন ঘটতে পারে। বিজ্ঞানগত হাইপথিসিসও বদল হয়, নূতন মতবাদ গড়ে ওঠে। পুরাতন হাইপথিসিস গুণগত পরিবর্তনে কখনও প্রত্যাহৃত (ডিসকার্ডেড) হয় আর কখনও নবরূপায়িত (অ্যাসিমিলেটেড) হয়। এই সত্য ইতিহাসের সত্য এবং বর্তমান আলোচনাতেও প্রযোজ্য।

ইতিহাস ব্যতীত এ প্রবন্ধ প্রস্তুত করার জন্য আমাকে পুরাতত্ত্ব, পুরা-ইতিবৃত্ত, পুরাণ থেকে প্রাপ্ত উপাদান গ্রহণ করতে হয়েছে এবং সেগুলিকে পরীক্ষা করতে হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের নিকষের দ্বারা। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে আছে ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব বা ব্যাকরণ এবং অবশ্যই শব্দার্থতত্ত্ব। মানবিক যে-কোনো অভ্যুদয়-বিবর্তনের ইতিহাসে ভাষার আবির্ভাব, এবং প্রয়োজন-কে ভাষার মাধ্যমে বোধে রূপান্তরিত করা একটা বিস্ময়কর ইনটুইশন; সেটাকে একপ্রকার কনডিশনড রিফ্লেক্স বলে প্রাথমিক বিবেচনা করা গেলেও শেষ পর্যন্ত তার রূপগত পরিবর্তনকে ইন্টুইশন বা প্রজ্ঞামেয় বলে ধরাই সঙ্গত মনে হয়েছে। অতএব এটিও মেথড-লজির মধ্যে পড়বে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই লিঙ্গুইস্টিকস বা ভাষা-তত্ত্বগত বিচার বিচার-বিশ্লেষণ এবং কালচারাল অ্যান-থ্রপলজি—এ দুটি শাখাতেই আর-একটি সংযোজনের কথা মনে পড়ে। এটি হল লোকোক্তি বা লোক-নিরুক্তি—সে যাই হোক। ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবং ধর্মসংক্রান্ত বিচার-বিবেচনার জন্য বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশের মানুষের লোকোক্তি-পরীক্ষণ একটা বিশেষ ট্র্যাডিশনাল উপায় বলে মানা যেতে পারে। পদ্ধতি-প্রণালী সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল বিশেষ কারণে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো একটা বাক্যকে অপরীক্ষিত বলে যাতে না মনে হয় সেজন্য এটা দরকার। সেই কথা বা বাক্যান্তর্গত শব্দসমষ্টির নিরূপিত সংজ্ঞা কোনো সরলীকৃত উপায়ে প্রাপ্তব্য নয়। সেই কারণে মেথডলজি না বলা থাকলে বিষয়বস্তুও বোঝা বা বোঝানো যায় না—অথবা বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাও দুর্বোধ্য মনে হয়। সেজন্য লেখকের ক্ষেত্রেও এটা নিজের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার। অপর দিকে, লেখকের নিজের কাছে এটা পরিষ্কার হলে তবেই তা

পাঠকের মনে সঞ্চারিত হবে—এটিও স্মরণ থাকা উচিত। পাঠক এবং লেখকের সহৃদয়হৃদয়সম্বাদ নাহলে, অথবা "গুরু বোব শিষকাল"—এমন হলে তো জ্ঞানক্ষেত্রে অগ্রসর হবার উপায়ই নাই। প্রতি লেখকেরই মনে একটা দুরপনেয় আশা থাকে যে পাঠক সে লেখাটা যত্ন নিয়ে পড়বেন। এও একটা বিশেষ কারণ যেজন্য পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে এত কথা বলতে হল। আমাদের দেশে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে কিছু না বললেও চলে। কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়মাত্রেরই একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি-প্রকরণ থাকা দরকার। বিদেশে এটি প্রথমেই অনুসৃত হয়। আমাদের দেশেও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবতারণা দরকার। ওই পদ্ধতির মধ্যে কয়েকটা পর্যায় থাকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায় সব-কটি মিলে যায়। কিন্তু আলোচ্য নিবন্ধের ক্ষেত্রে বা এইজাতীয় আলোচনা-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সব কটি পর্যায়-ক্রমে পাওয়া যায় না। [এ পর্যায় কটি প্রায় গবেষণা ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়: (a) gathering the data, (b) analysing the data, (c) arranging the data, (d) orientation or meaning seen through the data, (e) conclusion or resume]। একটা মাত্র স্তরে (d) বলা যেতে পারে যে এজাতীয় গবেষক কিছুটা মাত্র স্বাধীনতা পেতে পারেন। অন্যথায় তাঁকে সতত ডেটামাইনডেড হয়েই থাকতে হয়। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে এতটা ডেটামাইনডেড হবার অবকাশ নেই। তা বলে সেখানেও স্বাধীনতা স্বচ্ছল বা অবাধ নিশ্চয়ই নয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রবন্ধরচনায় দেখেছি প্রায় প্রতিটি ছত্রের পর বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো প্রলম্বিত হয় তথাকথিত ডাটা অথবা সাপোর্টিং এভিডেন্স। এটি বিজ্ঞানসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সম্ভবপর এবং সঙ্গতিপূর্ণও বটে। আমরা যে-জাতীয় আলোচনা করতে বসেছি তাতে এজাতীয় সংযোজন সর্বত্র পাওয়া অসম্ভব। যেখানে পাওয়া সম্ভব, সেখানেও আমার ব্যক্তিগত মতে উক্ত প্রকার সংযোজন দ্বারা নিজের সাধ্যসীমা সঙ্কুচিত হয়। তদ্ব্যতীত এতদ্দ্বারা আত্মনির্ভরতা বা স্বাধ্যায়ের ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় সূচিত হয় মাত্র। জ্ঞান-ক্ষেত্রের অবাধিতত্ব অর্থাৎ স্ববিরোধিতার অভাবই এখানে অদ্বিষ্ট এবং সেই অন্বেষা দ্বারা জ্ঞানলোকও প্রসারিত হয়। এই কারণেও আমার পদ্ধতি-প্রকরণের ব্যাখ্যায় পুস্তকাধারিত পংক্তি যুক্ত করি নি। মূল প্রবন্ধেও তা অনাবশ্যক মনে করেছি। তবে আত্ম-নির্ভরতা মানে অসততকতা যে নয়, তা মনে রাখার প্রয়াস করেছি। বিজ্ঞাননিষ্ঠ মানসিকতা নিয়েই যেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে না তাকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে যতটা সম্ভব হাইপথিসিসরূপে (টেনটেটিভ) গ্রহণ করেছি। সহৃদয় পাঠক কেউ এগুলির খণ্ডন-যুক্তি দিলে বা সংশোধনমূলক প্রস্তাব দিলে তা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব।

পরিশেষে নিবেদন করি যে, এই মিশ্রপদ্ধতি অর্থাৎ বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ-প্রকরণ মনে রেখে কিছু লেখা বা বলার অভ্যাস করার প্রেরণা পেয়েছিলাম আমাদের আচার্যদেব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন ও সজাগ চৈতন্য নিয়ে তিনি কী অসম্ভব জগৎ ও জীবনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারতেন সেকথা তাঁর যোগ্যতর ছাত্র-ছাত্রীরা আজও ভুলে যান নি। আমিও তাঁর এক অকৃতী শিষ্যা হিসাবে জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই গুরু-পরম্পরা গ্রহণ করেছি। তিনি আত্মোত্তরণ সম্ভব করেছিলেন। তাঁর মনীষা থেকে যে প্রেরণা লাভ করেছিলাম, সেটুকুকে সাধ্যমতো উপস্থাপিত করাই আমার একপ্রকার গুরুকৃত্য বলে মনে করি।

আমি যে কথা বলতে চাইছি তা পরিষ্কৃত হবে আচার্যদেবের বিশেষ কতকগুলি পুস্তকে। সেগুলি মূলত সোশ্যাল অ্যানথ্রপলজি বা কালচারাল অ্যান-থ্রপলজিমূলক এবং ধর্মীয় প্রত্যয়ের পাশ ঘেঁসে গিয়েছে। বালতো-স্লাভ, আফ্রিকানিজম, আবিসিনিয়া

অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, সাংস্কৃতিকী ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ভারত-কথা, কিরাতজন-কৃতি, মিডল-ইনডো এরিয়ান অ্যানড হিন্দি, শেষদিকে লেখা রামায়ণ, কৃষ্ণ-বাসুদেব ও কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নিয়ে লেখা, এবং সুফীমত নিয়ে প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনি এই "ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্" বিশ্বের তাবৎ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের উপর আশ্চর্য আলোকপাত যে করেছেন, প্রচলিত জ্ঞাত মেথড দিয়ে এগুলি বোঝা দুষ্কর। সেজন্যই পূর্বে ইনট্যুইশন কথাটার ব্যবহার করেছি। বলেছি যে ইনট্যুইশনই শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানেরও পদ্ধতি হয়ে ওঠে। এই ইনট্যুইশন সকল সময় অব্যর্থ, এমন নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু, এই প্রজ্ঞামূলক প্রমাধর্মীয় অসংশয়িত প্রত্যয় বা ইনট্যুইশন দ্বারা আমাদের আত্মোত্তরণ অথবা আলোকস্নান ঘটে—এই আমার বক্তব্য। আর, এই নূতন আলোকোদ্ভাসিত পথটির পরিচায়ক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—একথা নির্দ্বিধায় স্মরণ করি। তিনি বুঝেছিলেন—কিছু বিষয় আছে যেগুলিকে শুধুমাত্র বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান অথবা সাহিত্যকলা, ইতিহাসবৃত্ত দিয়ে বুঝাতে গেলে সেইটা অন্ধের হস্তিদর্শনতুল্য ন্যায়বৎ প্রতীত হবে। অতএব 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।'

আমার এ লেখার শেষাংশ রচিত হয়েছে বিশেষ ভাবে ভারতীয় ধর্মমত ও তাদের শাখাপ্রশাখাগুলি নিয়ে। এ বিষয়ে চতুর্থ চার্ট দ্রষ্টব্য। এই চার্টটিতে মোটামুটি একটা ইতিহাসদৃষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত ডেটা-গুলিকে সাজানোর প্রয়াস আছে। এই চার্টের সময়সীমা দীর্ঘ ও বিলম্বিত লয়ে বয়ে গেছে। ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তার শুরু ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিখণ্ডিত ভারত-উপমহাদেশ থেকে ইংরাজ রাজত্বের অবসান পর্যন্ত এসে তার বিশ্রাম। এই চার্টটিকে বিশেষভাবে ভারতভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের চার্ট বলা গেলেও অন্যভাবে এটি আমাদের তৃতীয় চার্টের বিষয়বস্তুকেই এদেশের প্রেক্ষাপটে এনে বিচার করেছি বলেই বলা যায়। এটি মূলত ইতিহাসনির্ভর চার্ট। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, ইতিহাসও মৌনমুখর দুই-ই। অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস নেই। কারণ যাই হোক, ভারত বহুলাংশে বলা যায় ইতিহাসবিমুখ। কোথাও ইতিহাসের ধাপ ভাঙা। সেটা মেরামত হয় না, তবু কল্পনা করা যায়। আবার কোথাও ঘটনাপরম্পরা অনুসরণ করে ইতিহাস তৈয়ারি করে নিতে হয়। বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য তা করা সতত সম্ভব হয় না—সূত্রও হারিয়ে যায়। তবুও সেইভাবে চলতে-চলতে একটা কোথাও এসে যে পৌঁছানো যায়, সেই সত্য চতুর্থ চার্টের দ্বারা সমর্থিত করার চেষ্টা করেছি। মোটামুটি বলা যায় যে, বিষয়াবতরণ, পদ্ধতি-প্রকরণ এবং চার্ট-সংযোজন—এ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য অতি রসহীন সন্দেহ নাই। সহৃদয় পাঠক আমাকে এজন্য একটু সহানুভূতিসহ যেন দেখেন, এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

বক্তব্য বিষয়ে আমার তিনটি কথা বলার আছে। প্রথমত, ব্যক্তিমানস কী ভাবে সংগঠিত হয় এবং সেখানে ধর্মের স্থান কোথায়। দ্বিতীয়ত, এই ধর্ম কথাটার সংজ্ঞা কী ভাবে কোথায় গৃহীত হয়েছে ও সেই ধর্মগত চর্যা কী ভাবে আবার মানবজীবনকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত করেছে, তার একটা বিবরণ। তৃতীয় কথাটা হল এই: ধর্ম কী ভাবে ভারতে এসে বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করল এবং কী ভাবে ধর্মচর্যা, ধর্মচর্চা, ভয়ভীতিসহ স্বর্গনরকাদি কর্মফলের মীমাংসাসহ এদেশের মানুষের মনে গৃহে সমাজে গৃহীত হল বা এখনও হয়ে চলেছে—তার একটা আলোচনা। বলা অসঙ্গত হবে না যে, এই তিনটি বিষয়ই পরস্পর সংযুক্ত হলেও পৃথকভাবে আলোচিত হবার উপযুক্ত। এই সংযোগ-বিয়োগসহ সমস্ত বিষয়টা প্রাঞ্জল করে কতটা তোলা সম্ভব, তাও আমার জানা নেই। এই আলোচনাক্ষেত্র আমার পক্ষেও নূতন। ইতিপূর্বে বৌদ্ধপুঁথি থেকে পাওয়া (পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ) উপাদানগুলিকে আমি আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের

আলোকে পুনরাবিষ্কার করার প্রয়াস করেছিলাম।* আমার সে প্রয়াসও একক। নূতন পথে চলার যে আনন্দ তাই মাত্র সম্বল করে "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা"য় প্রবৃত্ত হলাম। মনে করতে চেষ্টা করি "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

এক | আহরণ

ইতিহাস: প্রতি ঘটনা কার্যকারণাশ্রিত হলেও সেই পরম্পরাকে তুলে ধরা একটা অসম্ভব কাজ। এমনকী কারণকার্যের আনন্তর্য নিয়েও সংশয় জাগে। তা ছাড়া, যে-কোনো ঘটনায়, আপাতদৃষ্টিতে যাই হোক, কারণ বা কার্য একটি নয়, বরঞ্চ কারণপুঞ্জ ও কার্যপুঞ্জ বলাই ঠিক। এভাবে দেখলে ব্যক্তিমানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক—দুটোরই ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস চলমান তথা চলিষ্ণু। তাকে আইসোলেট করা যায় না। প্রাণজগতের ইতিহাসে হোমো-স্যাপিয়েন্স বা মানবপ্রজাতির জন্ম এখন পর্যন্ত আনুমানিক বারো কোটি বৎসর পূর্বে বলে ধরা হয়। মানবপ্রজাতি তার উৎকর্ষ নিয়ে একদিনে আবির্ভূত হয় নি। উদ্ভিদ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মার্জিনাল সূত্র, বায়োলজিক্যাল নানা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এককোষী ও বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে। তারপর বহুকোষী প্রাণীদেরও বিবর্তন ঘটেছে। একেবারে চেপটা-মাথা মাছ থেকে, তারও পূর্বের কীটাণু থেকে উভচর খেচর দ্বিপদ পক্ষী ও চতুষ্পদ প্রাণীরা এসেছে। অনেকে টিকে না থেকে শেষ হয়ে গেছে। তাদেরও পরে এসেছে প্রাইমেট বা বা-নর ও নরমানব। তাদের হাতিয়ারধরা হাত ও আঙুল হয়েছে এবং তারা হাঁটতে চেয়েছে। এবার এসেছে আদিমানব ও তার পরে পরে আসা উন্নততর ক্রো-ম্যাঁনন মানুষ। এদেরই আমরা আমাদের পরিচিত মানুষের প্রাক্‌গোষ্ঠী বলে মেনেছি। আজকের পরিচিত খাদ্যসংগ্রহ, বহন-সহন, বাসস্থান-ব্যবস্থার পিছনে তাদের গঠনমূলক প্রয়াস ছিল। এ কর্ম একদিনে হয় নি। এজাতীয় চিন্তার আধার হয়ে উঠতে ব্রেন বা গুরু-মস্তিষ্ক অনেক সময় নিয়েছিল। বিবর্তন-বিকাশ এইভাবেই পথ করে নেয়। মানুষ এখনও প্রজাতি হিসাবে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে টিকে আছে।

এই টিকে থাকার পথে সেই আদিমানুষ প্রথমে একক, এবং নিজের ছায়াকেও ভয় পেত। তার সিকিউরিটি ছিল না। বলশালী জন্তু বা স্ব-প্রজাতির হাতেই তার নিধন হত। আহার-সংগ্রহ দুরূহ ছিল। সেই ক্ষেত্রে কোনো একরকমে তারা দলবদ্ধ হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি তাদের গুরুমস্তিষ্ক চালনার পথের একটা জোর কদম বলা যেতে পারে। একে রুসোর মতো মনীষী সোশ্যাল কনট্রাক্ট বলেছেন। ইথোস বা মানবমঙ্গলনীতির একটা প্রাথমিকতম ব্যবস্থা গ্রহণ এটি এবং অবশ্যই একরকম যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত।

অনেকেই এইখান থেকে নীতিশাস্ত্রের সামূহিক কল্পনার বা কলেকটিভ এথিকস্‌-এর সূত্রপাত মনে করেন। আমাদের মনে হয়, এটাকে আংশিক সত্য ভাবা সঙ্গত। প্রাক্‌মানবজীবনে যে প্রাণিজগৎ ছিল বা আছে, তাদের মধ্যেও এই গোষ্ঠীগত বিচরণ বা গোষ্ঠীস্বভাব বর্তমান। সুতরাং আমরা অনুমান করি যে, এই গোষ্ঠীবদ্ধতা বা যৌথজীবন মানবপ্রজাতি তার রক্তপ্রভাবের জেনেটিক্যাল নির্মাণ দ্বারা পেয়ে থাকবে। সেটার সরলরূপ ক্রমে জটিলতর হয়ে থাকবে। এমনই আরও একটা কথা প্রসঙ্গত আসে। সেটা হল মানবপ্রজাতির ভাষার আবির্ভাব। এটাও ঠিক আবির্ভাব নয়। প্রাণিজগতের ভাষা আছে। কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে আমাদের অবোধ্য কিছু ইঙ্গিতাত্মক প্রতীকব্যঞ্জক প্রাক্‌ভাষাধ্বনি থাকা

---

* *Some Psychological Aspects of Early Buddhism as Based on Abhidharmakośa of Vasubandhu* (1980) Asiatic Society, Calcutta.

সম্ভবপর। প্রতি প্রজাতি নিজেদের ভাবের দ্যোতক প্রতীকীধ্বনি বোঝে। অনুমান করি, এ পদ্ধতির সরল রূপ জটিলীকৃত হয়েছে মানবপ্রজাতির ভাষার ক্ষেত্রে। চতুষ্পদ জগতে যে কণ্ঠ্যধ্বনি বা গাটারাল আওয়াজ আছে বা নাসিক্যধ্বনি আছে, মানবশিশুর ক্ষেত্রে শব্দোচ্চারণ কি এ দুটি দিয়েই শুরু হয় না? (আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের *Collected Papers* (Peoples Book House, Delhi থেকে প্রকাশিত)-এ বিষয়ে আলোকপাত আছে।

এই দুটি প্রকাশভঙ্গি ছাড়া প্রাক্‌মানব ও মানব অনুভূতির মধ্যে আছে তীব্র ভীতি-ও ক্রোধ-জনিত এক প্রকার অস্তিত্বব্যাপী সর্বাত্মক অনুভূতি। প্রবলের কাছে নতি একটা ছাড়া পাবার চেষ্টার সূচনা করে। প্রবলতা দিয়ে দুর্বলকে অভিভূত করা আর-একটা উপায়। এতদুভয় চেতনা থেকে আসে যথাক্রমে ভয় এবং ক্রোধের উদ্ভব। আমাদের মনে হয়, প্রাক্‌মানব জীবনে বা আদিম স্তরের মানবজীবনে এই চেতনাগুলি ছিলই। তাকে ধর্মীয় চেতনার জনক বলা অসঙ্গত হবে না। একদিকে মানুষ বা ব্যক্তি তার বাস্তবতাকে বুঝতে চেয়েছে। ভেঙে গড়তে বা গড়ে ভাঙতে চেয়েছে। তাই হল ট্রায়্যাল অ্যানড এরর। তা থেকে এল লারনিং। পূর্বাপর এ লারনিংকে আমরা একটা শৃঙ্খলায় আসতে দেখি সেসব মানুষদের। তা থেকে জন্ম নিল যুক্তি বা রীজন; রীজন-এর অ্যানালিটিক দিকটা হয়ে উঠল বিভিন্ন বিজ্ঞানে রূপান্তরিত। আর, তার সিনটিথেটিক দিকটা হয়ে দাঁড়াল তত্ত্বগত চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কিত 'দর্শন' (চার্ট ১ দ্রষ্টব্য)।

অপর দিকে এও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যুক্তির পূর্বোক্ত এই পদ্ধতিটি এত সহজে আবিষ্কৃত বা গৃহীত হয় নি। বাস্তব পরিবেশকে আয়ত্ত করাও সহজ ছিল না এবং এখনও নয়। তৎকালীন আদিম মানবদের মস্তিষ্কচালনা বা বিচারবোধও এক ধরনের ছিল না বা স্ট্যানডার্ডাইজডও ছিল না। বরঞ্চ বলা প্রয়োজন যে, মানুষে-মানুষে শক্তির ও অধিকারের তারতম্য ছিল। এরূপ অধিকারিভেদ এখনও মেনে নিতে হয়। অতএব মানদণ্ডের বিচারে দেখা যাচ্ছে, তখনকারের মানুষের বিচারবোধ বিবেচনা সময়ের হিসাব মেনেই আজকের মানুষের চেয়ে পিছিয়েই ছিল। সেই পিছিয়ে থাকার মূলে ছিল স্বীয় অশক্তির বোধ, অভাবের চেতনা এবং স্বভাবের প্রকৃতিগত বিচার ও কাজ। অনুমান করা চলে যে, এজাতীয় অশক্তির চেতনা থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসাবে সে আদিম মানুষ ধর্মকে আশ্রয় করেছিল। একটা কথা পরিষ্কার করে বলা উচিত যে, "ধর্ম" কথাটার আজ যেভাবে আমরা সংজ্ঞা নির্ণয় করে থাকি, সেই অনুন্নত প্রাক্‌মানবেরা সেই অর্থে ধর্ম কথাটা বোঝে নি। তারা যে অর্থে বুঝেছিল, তার একটা আনুমানিক গতিপথ এখানে বর্ণনা করা হল :

ধরা যাক, একটি প্রাক্‌মানবগোষ্ঠী পথ চলছে। দিনের আলো আছে। সূর্যকে তারা সহায়ক ভাবল। রাত্রির আছে অন্ধকার; সেই ঘন অন্ধকারে প্রথমে একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে হয়তো শীতের রাত যাপন করা। রাত্রে চন্দ্রালোকও আছে। সেটা পর্যাপ্ত নাহলেও চন্দ্রালোক ও তারালোক কিছু ভরসা যোগায়। রাত্রে পশু আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। তীব্র শীত অথবা তীক্ষ্ণ সূর্যালোকে রোগভোগও আছে। পরিণামে ছোটো বা বড়ো তার জীবনাবসান বা মৃত্যুও আছে। ক্ষুধা ও জলপিপাসা আছে। দুই ক্ষেত্রেই হিংস্র পশুকুলের আহার্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। সাপ, বাঘ, বিষকীট বা এতজ্জাতীয় মৃত্যুদূত স্থলে জলে বিদ্যমান। কোনোমতে এই জলে কুমির ডাঙায় বাঘ বাঁচিয়ে আহারের সংস্থান হত। এর পর আছে জৈব ক্ষুধা ব্যতীতও স্বাভাবিক যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির প্রয়াস। এক্ষেত্রেও শক্তি-অশক্তির পরীক্ষা দিয়ে সে মানুষকে যৌনক্ষুধার তৃপ্তি খুঁজতে হত। তার দ্বারা যে বংশগতির বিস্তার ও প্রজাতিরক্ষা হয়, একথা বুঝতে সময় লেগেছিল। মোটকথা, আদিম জীবনের এই পর্বকাল দীর্ঘস্থায়ী ছিল। এর মধ্যে তার সর্বাধিক প্রবল বোধ

ছিল ভীতি আর ইনসিকিউরিটি! ক্রোধ পরে এসে থাকবে, তখন আদিমমানব খানিকটা আত্মশক্তির নিরীক্ষা-পরীক্ষার মাধ্যমে একটা নূতন চেতনাকে অস্তিত্বে আত্মসাৎ করে থাকবে বলে মনে হয়। অন্ধকারে ভয় লাগে, সূর্যালোকে সে ভয় শান্ত হয়। সূর্যচন্দ্রতারার আসাযাওয়ার একটা নিয়মও তারা বুঝল। পাখি আকাশে ওড়ে এবং মানুষ তা পারে না—এটা বোঝা গেল। সূর্যচন্দ্রতারাদের আকাশেই দেখা গেল। পশু ও মানুষ এককালে পারস্পরিক খাদ্যখাদকসম্বন্ধাবদ্ধ ছিলই। ক্রমে দেখা গেল, পশু একক হলে যূথবদ্ধভাবে তাকে মারা সহজ। পশুখাদ্য বেশি সংগ্রহ করা আর শুকিয়ে রাখার কথাও মনে হল। পশুর চামড়া দিয়ে নগ্ন শরীর ঢাকলে শীত যায় —এটা বোঝা গেল। তার নীচে আশ্রয় নিলে রৌদ্রের তীব্রতা থেকেও বাঁচা যায়—এ চেতনা হল। পশুকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়াও অন্য খাদ্য ছিল—পাতাফুলফল ও কন্দমূল। রোগভোগের সঙ্গে এসব খাদ্যের যোগ দেখা গেল। আকস্মিক কোনো ফল-মূলকন্দ বা পাতা খাওয়ার ও রোগ-নিবৃত্তির একটা যোগসূত্র দেখা গেল। যেমন ধরা যাক, হলুদ বা আদার মূলের উপকারিতা। এই উপকারী শক্তি ও অপকারী শক্তি (বিষঘ্ন ও বিষ)—দুই চেতনা পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকল। এগুলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখা দিল লাঠির মতো হাতিয়ার, প্রাইমেট বা বানরও তা ব্যবহার করতে পারত। (এখনও যে পারে, সেটা দেখা যায় কফকা ও কোহলারের পরীক্ষায় বন্দী বানরকে দুটি লাঠি দিলে ও খাঁচার বাইরে একটি ফল রাখলে সে প্রথমে কাঠি দুটো নিয়ে খেলা করে এবং অবশেষে কোনো আকস্মিক উল্লাস বা ইনসাইট দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে দুটো কাঠিকে জোড়া দিয়ে ফলটাকে টেনে নেবার ব্যবস্থা করে।) এই উদাহরণগুলির সাহায্যে যে কথাটা স্পষ্ট করতে চাই তার নির্গলিতার্থ হল—একপ্রকার শক্তির চেতনা—সে শক্তির প্রকাশ সর্বত্র সমান নয়; সে শক্তি নির্জিত করে ও ভয় দেখায়; একই ফল বা মূল খাদ্য হিসাবে ভালো বা মন্দ ফল প্রসব করে। অতএব, অন্ধকার এবং অন্ধকারের মতো অজানা অনেক শক্তি আছে যেগুলি ভয়াবহ। আলোর শক্তিও স্বীকৃত—স্থানবিশেষ তাও ভয়াবহ হতে পারে (যেমন দাবানল)। সে আগুনে বন পুড়ে যায়, আহার্য পশু পুড়ে মরে। কিন্তু চেতনার পরিধিও বাড়ে। তখন দগ্ধ পশু খাওয়া অনেক সুস্বাদু মনে হয়। দাবানল থেকে আগুনের অংশ বাঁচিয়ে বা জ্বালিয়ে রাখা যায় কাঠ দিয়ে। জ্বালিয়ে রাখা মানে শরীর উত্তাপ পায় এবং হিংস্র পশুও ভয় পায়। এই শুভাশুভশক্তিকে তারা ভয় করত। যেমন একটি বড়ো পশুর সামনে বাচ্চা পশু অসহায় আত্মসমর্পণ করে, তেমনই ভাবে এরাও করত আত্মসমর্পণ—ভয়ে এবং রক্ষা পাবে বলে। এ ভয় প্রসারিত ছিল প্রাকৃতিক সকল অজানিত অজ্ঞাত আনুমানিক শক্তি পর্যন্ত। বড়ো গাছ, বৃক্ষাশ্রিত সাপ, বন্য পশু, তৃষ্ণার জলের আশ্রয় নদী বা হ্রদের হিংস্র পশু, ঝড়ঝঞ্ঝা, গড়িয়ে-পড়া পাথর, বজ্রাগ্নীতি, জলহীনতা, খাদ্যাভাব, অজানা খাদ্যজনিত বিষক্রিয়া, শারীর পীড়া, যেমন জ্বর বা অস্ত্রাঘাত বা শরীর বিষিয়ে ওঠা, সর্বোপরি সকল শত্রুর আশ্রয় অন্ধকার—সবই তাদের কাছে ছিল ভয়াবহ। এই ভয়কে তারা জয় করতে জানত না—ভয়ের কাছে জানাত নতি। অর্থাৎ ভয়ের বস্তুই যেন তাদের রক্ষা করে—এই ছিল মনোভাব। অবশ্য একথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে এইরকম মনোভাব ছিল সম্ভব। আদিম মানুষের চেতনা ভাবনা একমাত্র খাদ্য- ও আশ্রয়-নির্ভর হওয়াই সম্ভব ছিল। তাদের জগৎ ছিল তাই নিয়ে। অথচ তার সেই জগতে হত্যা-মৃত্যু এগুলি ছিল। তার হিসাব ব্যাখ্যায় মিলত না। জৈব নিয়মে যৌনসংসর্গ হত। তা থেকেই যে বিশেষ নর-নারীর সঙ্গসঙ্গমে পুত্রকন্যার জন্ম, তা বুঝতে তাদের অক্ষমতা ছিল। সেজন্য পশুজগতের মতো অজাচার তখনও সে ক্ষুদ্র সমাজে নিন্দিত হয় নি।

তবে সময় তো সর্বদা এগিয়ে চলে। একদল

মানুষের পর অন্যদল আসে। ক্ষুধার খাদ্য, আশ্রয়ের গুহা, যৌনজীবনের সঙ্গী নিয়ে সততই সংগ্রাম-সংঘর্ষ চলে। একদল অন্যদলকে প্রবলভাবে শেষ করে দেয় —যারা বাঁচে তারা বিজিত হয়ে বিজয়ীকে মেনে নেয়। আসে নতিস্বীকার। স্ত্রীলোক দলের পক্ষে অপরিহার্য—পুরুষেরই মতো। তাকে সংগ্রহ করে জয় করে এনে বেঁধে রেখে বহু আয়াসে পোষ মানানোর দরকার হত। বর্তমানের শাঁখা, সিন্দুর, আংটি-লৌহবলয় বা অপরাপর যা-কিছু ধারণ করা বিবাহের মাঙ্গলিক প্রতীক বলে চিহ্নিত, তার সবই অতীতের ভুলে-যাওয়া প্রতীকীভবনের ইতিহাস। অলঙ্কারগুলি কোথাও উৎকোচ পরের দিকে। প্রথম-দিকে দণ্ডবেড়ি।

অবশ্য এর সবটাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাপার ছিল। কাজেই শুনতে ভালো লাগার মতো এক-প্রকার রূপকথার কাহিনী বলে গ্রহণ ছাড়া সত্যাসত্য প্রমাণ করা আমার অসাধ্য। তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে, এরই মধ্যে বীজাকারে কিছু রূপক, কিছু প্রতীক আচারীভূত চর্যা বা এথিক্সের রূপ নিয়েছে, এবং ধর্মানুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। অথচ, ওই পূর্বোক্ত টাল-মাটালের যুগে ধর্মনীতি বা তথাকথিত কোনো রিলিজন যে ছিল না, এটাই বলা যায়। (চার্ট ৩ দ্রষ্টব্য) এভাবে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ও নেই। এই কারণেই আজকের দিনের সমাজে প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের ছায়া-উপচ্ছায়া খুঁজতে গেলে আমাদের এই অতীতের অ্যানথ্রপলজি-সংগৃহীত উপাদান নিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয়।

পূর্বোক্ত সেই পথ দিয়ে মানবজীবন তথা মানব-মননকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তার জগৎ এবং জীবনে এসেছে দাবানল থেকে পাওয়া অগ্নিচয়ন ও অগ্নিসংরক্ষণ। অগ্নিসংরক্ষণের উপায় হয়েছে গুহাতে। তাকে জাগিয়ে রাখার কাজ দেওয়া হয়েছে খাদ্য-সংগ্রহে অপটু বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের। অর্থাৎ শিশু, বয়স্ক-সমর্থ বা অ্যাডাল্ট এবং প্রায়-অকর্মণ্য বৃদ্ধদের নিয়ে একটা কর্মবিভাগও গড়ে উঠেছে। গুহাহিত অগ্নি জ্বালিয়ে রাখতে পারলে সেটি তাদের কৃতিত্ব। যা ছিল প্রয়োজনের সাধনা, এখন তা রক্ষা করতে পারলে করায়ত্ত। এটিরও উৎকর্ষ ঘটল। আকস্মিক সমাপতনে কোনো মানুষ বা মানুষেরা চকমকি পাথর বা ফ্লিনট ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখে গেল। এইখানে মানব-সভ্যতা একটা বড়ো স্তরে উন্নীত হয়ে গেল। আগুন তার করায়ত্ত—খাদ্য পাক করা, হিংস্র পশু তাড়না, কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে রাখা, মশালের মতো জ্বেলে অন্ধকারের ভয় ভাঙানো—এতগুলি প্রয়োজন সিদ্ধ হল আগুন পাওয়াতে। যা ছিল প্রয়োজন (নীড), তা হল উপরি পাওনা (বা এক্সেস)। মানুষের চিন্তায় এল প্রগতি। সে অকৃতজ্ঞ নয়। সে অগ্নির দাহিকা শক্তির কাছে প্রণত হল। অগ্নি হল সদর্থক শক্তি সূর্যচন্দ্রতারার মতোই। অপর পক্ষে, সে অগ্নি দগ্ধও করতে পারে—তার ধ্বংসাত্মক শক্তিও আছে, সেটা নঞর্থক এবং অন্ধকারের মতোই সম্ভবত আদিম মনে উপাস্য হিসাবে সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়েছিল সূর্যচন্দ্রতারা, এবং অবশ্যই তারপর অগ্নি। পরবর্তী কালে অগ্নির মহিমাই সমধিক হয়ে ওঠে। আজ পর্যন্ত সকল প্রচলিত ধর্মমতে কোনো-না-কোনো ভাবে অগ্নি-উপাসনা অগ্নিজ্বালানো স্বীকৃত আছে। বহুধর্মমতে সূর্যই দেবতা—চন্দ্রতারা আপনাপন বিশিষ্ট গৌরবে সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। সূর্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় রূপে নিজেদের কল্পনা করেছে মানুষেরা। আরও পরবর্তী যুগে দেখতে পাচ্ছি—ঈজিপ্টের রাজ-বংশে (বর্বরযুগের আদিতে—চার্ট ৩ দ্রষ্টব্য) সূর্যই পিতৃপুরুষ—এটা দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে। একদিকে আমরা দেখছি গ্রীকো-রোমান কাহিনীর (লেজেনড) প্রমেথিয়ুস অগ্নি এনে দিয়েছেন মানব-কল্যাণের জন্য। সেজন্য তিনি শাস্তি পেলেন দেবরাজের কাছে। হারকিউলিস পরে তাঁকে মুক্ত করেন। রামায়ণ-কাহিনীর সূর্যবংশসম্ভূত নায়ক রাম। অপর দিকে মহাভারতের কুরুবংশ এসেছে চন্দ্রবংশোদ্ভব

বড়ো পশুর সামনে)। আমরা ভুল করব না যদি বলি—কোনো অজানা অজ্ঞাত প্রবল শক্তির কল্পনার কাছে সেদিনের মানুষ যে নতিস্বীকার করেছিল তার ভাষা অবোধ্য ছিল না—কথিত বা অকথিত সে ভাষার মর্মবাণী ছিল—'রক্ষা করো'। এই সরল ভাবনাই পরে জটিল হয়ে ওঠে মানুষের চেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে। তখন মানুষ জ্ঞানে অজ্ঞানে যা কিছু দুর্বোধ্য অথচ কোনো শক্তির সহায়ক সে সবকিছুতেই আত্মপ্রক্ষেপ (সেলফ-প্রোজেকশন) করে নতি স্বীকার করেছিল। একটা উদ্দেশ্য—নিজকে রক্ষা করা। অন্য উদ্দেশ্য শক্তিধরের সাহায্যে শক্তি বাড়ানো। দুটি ভাবনার ক্ষেত্রে সক্রিয় মনোভাবটি হল একপ্রকার আত্মসম্মোহন (অথবা অটোসাজেসশন তথা সেলফ হিপনোটিজম)। এ দুটি ভাবনা থেকে জন্মলাভ করে ধর্মীয় ভাবনা, ঈশ্বর-চেতনা বা সমজাতীয় আশ্রয়াশ্রিতের অন্যোন্যনির্ভরতার কল্পনা। যা কল্পনা ছিল, তা যুক্তির পথে না গিয়ে ভীতি আর নতির পথ গ্রহণ করছিল। (চার্ট ১ ও চার্ট ২ দ্রষ্টব্য)।

এই মহাশক্তিকে আফ্রিকীয় ভাষায় এবং কোনো কোনো উপজাতিদের মধ্যে "মানা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমে সেটা নিয়ে যে দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে তার নাম "মানাইজম"। ধর্মজীবনের ইতিহাসে এটি একটি বড়ো সিঁড়ির মতন বলা যায়। এ ব্যাপারটিকে যদি একসত্তা ধরা যায়, তবে তার বহু সত্তার ভিতর দিকে প্রকাশমানতাও লক্ষণীয়। হিংস্র পশু, সাপ-বাঘ, কুমির, স্রোতের তোড়, আকাশের বিদ্যুৎশিখা, বিষাক্ত গাছ বা ফল-ফুল বা খাদ্য এবং শরীরের পীড়া—এর সবারই মূলীভূত কারণ দাঁড়াল ওই একটাই শক্তি। এ শক্তির তখনও নামকরণ খুব বেশি হয় নি বলে অনুমান করা যায়। এ শক্তির উদ্দেশ্য একটাই: সেটা হল ভীতিপ্রদ হয়ে নিপীড়ন করা। এ শক্তিকে কেন্দ্র করে সম্ভবত দুটি বা তিনটি ভিন্ন গোত্রের মানুষ আবির্ভূত হল। আমরা মনে করতে পারি যে, সব মানুষ কিছু একই রকমের প্রকৃতি বা শক্তি নিয়ে স্বভাবত জন্মগ্রহণ করত না বা একরূপ হত না। সেখানেও অধিকারিভেদ ছিল—এটা বলা যায়। সেই নীতিগত নিয়মে সবল মানুষ দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করতে পারত। দুর্বল যারা তারা আনুগত্য প্রকাশ করে বাঁচতে চাইত। এবং একটা মধ্যমবর্গীয় উভয়ত্রই সুখসুবিধা অর্জন করে টিকে থাকত। সবল শ্রেণীও দ্বিধা ছিল—বুদ্ধির প্রাখর্যে এবং শক্তির প্রাচুর্যে। অনুমান অসঙ্গত হবে না যদি বলি, প্রথমোক্তদের থেকে পরে এল পুরোহিতশ্রেণী—যারা হল ভাগবতশক্তির সূত্রধর (বা এজেনট)। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে উদ্ভব হল একধরনের সর্দারদের যারা আধিপত্য করত। এই তিনটি শ্রেণীর অতিরিক্ত যারা তারা সেদিনও চালিত হত অন্যদের দ্বারা আজকের দিনের আমজনতার মতো। প্রথম দুটি শ্রেণী নিজেদের সুবিধার জন্যই একটা অলিখিত মিত্রতার বন্ধনে বাঁধা ছিল। পরস্পরকে তারা প্রয়োজন মনে করত। ভাগবতশক্তির আধার হিসাবে ভালো জিনিস তারা প্রাপ্য মনে করত। পাঠক ভেবে দেখবেন—বর্তমান কালেও এই একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমাজমানস চলে এসেছে কিনা।

প্রিমিটিভ কমিউনিজমের কালটি যে দীর্ঘায়ত, তা আমরা আগেই বলেছি। পরবর্তী অসভ্য যুগের (বা স্যাভেজারি) বহুরকম প্রস্তুতি এই সময়টার হয়ে থাকবে। ধর্ম সম্বন্ধীয় বহুবিধ উপাদান বীজাকারে এই সময়টায় উৎপন্ন হয়েছিল—এমন মনে করা যেতে পারে। এই কালে পূর্বোক্ত শ্রেণীর লোকেরা কিছু নিরীক্ষা-পরীক্ষাও করছিল। যেমন পশুমাংস খাওয়ার জন্য পশুহনন করে-করে পশুটি হয়তো পাওয়া দুর্লভ হত। তখন ওই পশুকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হত—(এটি ট্যাবু)। দল বেঁধে বলা হত—ওই পশু তাদের আদি পুরুষকল্প। এমনটি ভাবা হয়েছিল রোমের প্রতিষ্ঠাতা রমিউলাস সম্পর্কেও। বলা হত তিনি সিংহশাবক। বহু উপজাতিগোষ্ঠীতে পৃথিবীর সর্বত্র

হিসাবে। ইন্দো-ইয়োরোপীয়-ভাষাভাষী ইন্দো-ইরানীয়গণ অগ্নি উপাসক। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার পরাক্রান্ত ইনকা-মায়া-আজটেকদের উপাস্য সূর্য-দেবতা। এখনও বহু উপজাতির মধ্যে প্রচলিত ধর্ম-কাহিনীতে সূর্য-চন্দ্র দুজনাই পিতামাতা হিসাবে স্বীকৃত। অগ্নিকে মানা হয় পবিত্র বলে। ভারতে আগত এবং ইরানে স্থিত আর্যদের যজ্ঞে অগ্নির বিশিষ্ট স্থান। কালক্রমে যজ্ঞবিধির নানা জটিল পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হল এই অগ্নির উপাসনা। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়—ইন্দো-ইরানীয়-ভাষাভাষী সোভিয়েত দেশের এক প্রান্তীয় উপজাতির নাম ইয়াগ্নবী বা অগ্নিগণ বা অগ্নিসম্ভব। কালক্রমে অন্যান্য বহু দেব-দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, তারা কিন্তু অনেকভাবে মিশ্রচরিত্রসম্পন্ন বা সিনথেটিক হয়ে উঠেছে। আদিম অকৃত্রিম অগ্নি-উপাসনা প্রায় একই ভাবে রয়ে গেছে। কোথাও তা চিরাগের রোশনি, কোথাও তা ক্যানডল হয়ে অলটারে জ্বলে, আর কোথাও তা দেবালয়ের প্রদীপ হয়ে ওঠে। বলা প্রয়োজন যে এই অগ্নির অভিযানের চিত্রটি যত পরিষ্কারভাবে আমরা অনুধাবন করতে পারি, অন্য দেবদেবীর ইতিহাসধারা এমনভাবে চলে আসতে দেখি না। এমনকী সূর্যের বা চন্দ্রের উপাসনাও নয়। যদিও হিন্দু ধর্মে পঞ্চোপাসনার মধ্যে সৌরপূজা একটি আছে। মুসলমান ধর্মমতে রমজান মাসের উৎসব শেষ হয় চন্দ্রদর্শনে। ভারতীয় সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সৌরমাস তিথি (শকাব্দ) এবং আরব-জীবনানুসারে গৃহীত চান্দ্রমাস পরিগৃহীত হয়েছে মুসলমান ধর্মের মাস-তিথিপরিকল্পনায়।

প্রাগৈতিহাসিক মানব একস্তর থেকে সহসাই যেন অগ্নিস্পর্শের ফলে ইতিহাসের অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করে গেল। মানব-অভ্যুদয়ের বিবর্তনের এই স্তরটিকে আমরা আদিসাম্যভাবাপন্ন সমাজ আখ্যা দিয়ে থাকি। অগ্নিকে কেন্দ্র করে জাগল চমৎকারিত্বের ভাবনা। ভাবনাকে কী ভাবে ঠিক জানি না—একটি ভাষাতেও মানুষ রূপ দিল। প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির অনুষঙ্গ হিসাবে ধ্বনিত শব্দ অর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠল। এসব শব্দের ব্যবহার সর্বত্র এক নয়। আমরা ঠিক জানি না—কবে কোথায় কোন্ মানুষ আবির্ভূত হয়েছিল বা কে কোন্ স্তরে ছিল। আফ্রিকার মানুষ বা জাভা-পিকিং-এর মানুষ বা আমাদের জানা পৃথিবীর মানুষ কোথায় একত্রই ছিল, না কি, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল—এসব প্রশ্ন আজ তুলে লাভ হবে না। তবু এরকম একটা কিছু সম্ভাবনা থেকেই যায় যে, মানুষ একস্থান থেকে আরেক স্থানে যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করে চলে গেছে এবং কিছু মৌল অভ্যাসও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আবার নূতন স্থানে যাবার পর স্থানকালপাত্রানুসারে তাদের খাদ্যসংগ্রহ ও বিচরণের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে। তবুও মৌল কাঠামোটা চেনা যায়। এই আদি সাম্যভাবাপন্ন সমাজ (বা প্রিমিটিভ কমিউনিজম: চার্ট ৩ দ্রষ্টব্য) যুব দীর্ঘায়িত ছিল। পরবর্তী কাল অর্থাৎ অসভ্য যুগের (স্যাভেজারি পিরিয়ড) থেকে একান্ত পৃথক হলেও মনে হয়, কিছু অগ্রপশ্চাতের লক্ষণ সেখানে বর্তমান ছিল।

প্রসঙ্গগত একটা লক্ষণ আলোচনা করা যাক। নতিস্বীকার, এবং প্রণামের ভঙ্গি, দুটি হাত যুক্ত করা, শালোম (শান্তি) বা আসসালাম আলায়কুম বলার ভঙ্গি, করমর্দন করা, দুই হাতে (মঙ্গোলীয় উপজাতি লক্ষণীয়) কান ধরে জিহ্বা দেখানোর মতো যত প্রকার অভিবাদনপ্রথা এখনও প্রচলিত আছে, তার সবকটির মধ্যেই একটি সুর বেজে ওঠে—তা হল অনাক্রমণভাবনা অর্থাৎ ক্ষতি না করার একটা প্রতীকীভূত প্রকাশ। মানুষের কাছে বা শক্তিমানের কাছে এ নতিস্বীকার পরে সামাজিক শিষ্টাচারে পরিণত হলেও প্রথম যুগে তাই ছিল সবলের কাছে দুর্বলের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অসহায়তা প্রকট করা ও প্রার্থনা করা। হয়তো প্রাণের জন্য (যেমনটি বাচ্চা পশু করে থাকে

এরূপ পশুনাম বা বৃক্ষনাম পাওয়া যাবে। এই পশু-নাম টোটেম বলে স্বীকৃত। টোটেমগোষ্ঠিগুলির মধ্যে আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করা হতে লাগল। জন্ম নিল আদিম এথিক্স বা মরাল কনশাসনেস। এটিকেও পূর্বোক্ত ভগবৎ-কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে দেখা হতে লাগল। নিয়ম-কানুন-গুলির বিধিনিষেধগুলির পরিচালনাভার রইল সেইসব অধ্যক্ষদের হাতে যারা কেউ দলীয় পুরোহিত, দলের সর্দার বা নূতন কোনো পথপ্রদর্শক। বলা বাহুল্য, এইসব দলপতিদের মধ্যে সতত বিরোধ লেগে থাকত, নিজের স্বরক্ষার জন্য। বুদ্ধিমান লোকেরা এসময় নিজস্ব প্রতিভায় নানারকম শিকড় শস্য সুখাদ্য ঔষধ প্রভৃতির উদ্ভাবনাও করত। তারা হয়ে উঠত দলীয় বা গ্রামীণ ওঝা বা বৈদ্য। কিন্তু, এদের সকলের মধ্যেই একটা শক্তি বা মানা সম্বন্ধে চেতনা ছিল। টোটেম-ট্যাবুর মধ্য দিয়ে ঘুরেফিরে তারা সেটাই প্রকাশ করত। এই টোটেমিক নাম বহন করে আছে বর্তমান কালে সিংহ, নাগ, বাঘ, একা (কচ্ছপ) প্রভৃতি প্রাণিবাচক শব্দ অথবা কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষবাচক শব্দ। এগুলি এদেশের। এরকমভাবে ধ্বনিত গৃহীত শব্দের ইতিহাস খুঁজলে তার অর্থ অন্যান্য ভাষায় পৃথিবীর নানা স্থানে মিলবে এখনও। একটা কথা বলা দরকার যে, স্ব-স্ব টোটেমের মানুষেরা কখনও-কখনও সমবেত ভাবে ট্যাবু লঙ্ঘন করত—সেটাও ছিল ধর্মীয় উৎসবের মতো একটা প্রক্রিয়া। (তুলনায় বর্তমানে ভারতীয় উপজাতিদের ভূমিপুত্রদের একটা বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার অভিযানে যাত্রা এবং গোপবংশীয়দের মধ্যে প্রচলিত হৈমন্তিক ঘোষ-যাত্রা)।

টোটেম আর ট্যাবু ব্যতীত আরও কয়েকটি শব্দ আমাদের বুঝতে হবে। সেগুলি হল—অ্যানিমিজম, স্পিরিটিজম, ও ফেটিশিজম এবং প্যানসাইকিজম। এগুলি মূলত ধর্মীয় উপাদানকে সামাজিক জীবনসহ যুক্ত করেছে। আদিম মানসে মৃত্যু ছিল প্রথমে একটা দুর্বোধ্য সত্য। পরস্পর লড়াই করে হোক বা বার্ধক্যের মৃত্যু হোক, মানবীয় চেতনার সেই আদিম স্তরে সেটাকে পরিপাক করা শক্ত ছিল। আরও একটা কঠিন ব্যাপার ছিল মৃতকে স্বপ্নে দেখা। এটা তাদের মাথায় বিষম ভয়ের সৃষ্টি করত। যে লোক বাইরে অপসৃত হয়, তার দৃশ্যত দেহাবসান হয়। কোনো-কোনো উপজাতির মধ্যে বয়স্ক মানুষেরা অশক্তির শেষ সীমায় এলে একটা উৎসবের মধ্যে নেচেগেয়ে খেয়ে আর খাইয়ে তাদের মেরে ফেলা হত। সেই মৃতের রক্তমাংস নিঃশেষে বাকি মানুষেরা খেয়ে নিত। এটি তাদের শ্রদ্ধার প্রদর্শন ছিল। তারা মনে করত—এই বৃদ্ধ প্রজন্ম থেকে তাদের উৎপত্তি। অতএব তাদের উচিত এদের নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করে গ্রহণ করা। না করাটা তারা অনুচিত মনে করত। যাই হোক, এই মৃতেরা স্বাভাবিকভাবে স্বপ্নে এসে যেত। মানুষেরা ভয় পেত আর ভাবত যে এরা অদৃশ্য হলেও এদের কাছে সবই তো পরিদৃশ্যমান। অতএব এরা প্রচুর শক্তিমান এবং অনিষ্ট করতে সক্ষম। তখন নানা দলের মধ্যে নানা উপজাতির মধ্যে এই মৃতকে তোষণ করার জন্য খাদ্য জল দেওয়া হতে লাগল। নাগাদের, আফ্রিকীয় শিকারিদের মধ্যে প্রচলিত এ ব্যবস্থা থেকেই এসেছিল যথ-আনব-আমেনের সমাধিতে জীবন্ত প্রাণী ও মানুষ কবর দেওয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মে মৃতদেহের সামূহিক সৎকার, কোথাও কবর দেয়া, কোথাও পোড়ানোর ব্যবস্থা। আজকের দিনের প্রায় সকল সভ্যসমাজে কোনও না কোনও প্রকার শোকজ অশৌচপালন ও শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, যা দেখা যায় আদিতে তা এসেছে এই মৃতকে ভয় পাওয়া ও সেই ভয় অপনোদনের জন্য মৃতের কোনো অস্থি-মাংস-ত্বক ইত্যাদি গৃহে এনে পূজার মতো উপচার দিয়ে তোষণ করা। বৌদ্ধস্তূপ-গুলির মধ্যে সর্বত্র এরূপ কিছু অবশেষ বা রেলিকস বর্তমান। উত্তরকালে এই ফেটিশিজম সকল ধর্মের

সঙ্গে মিশে উত্তরোত্তর বিকাশলাভ করেছে। খ্রীষ্টীয় ক্রসচিহ্ন ধারণ করা একটা স্পষ্ট প্রতীকীভবন এই ব্যাপারে।

মৃত্যুর পাশাপাশি আছে জীবনের নানা লীলা। সেখানে দেখা যাচ্ছে—প্রকৃতির নানা শক্তির প্রকাশ। গাছ পড়ে যায়, মানুষ চাপা পড়ে। ভূমিকম্প হয়, মানুষ মরে। তীব্র শীত, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, ভয়ঙ্কর ঝড়, বন্যার স্রোতে অবস্থানের অনিশ্চিতি—এগুলিও শক্তিধর কারও স্থিতি নির্দেশ করে। এখানেও প্রাণ আছে অথবা কোনো অশুভ শক্তি অদৃশ্য ভাবে কাজ করছে। এগুলিকে পরে নাম দেওয়া হয়ে থাকবে অ্যানিমিজম এবং স্পিরিটিজম। এরই উন্নততর সংস্করণ হল অনেক পরে পাওয়া সর্বভূতান্তরাত্মা অথবা প্যানসাইকিজম। যুক্তির পথ গিয়েছে বিজ্ঞানের দিকে—আর এই কল্পনা ও ভীতিমিশ্র মনোভাব গিয়েছে ধর্মচেতনার দিকে। প্রায় সব দেশে, প্রায় সব ভাষায়ই এজাতীয় কিছু মৌলশব্দ মিলবে। ঈশ, দিও, দেব, ডিইটি, বগ, ভগ (ঐশ্বর্য), ভগবান, বগাচেলি, বহাদুর, আলে, আল্লাহ, মহৎ, অসুর, অহুরমজদ—এই নামগুলি সবই প্রায় একার্থবোধক একেশ্বরবাদী শব্দ বলা যায়। অপর দিকে শক্তিমাত্রই দেববাচক বা ভক্তির পাত্র। সুতরাং বৃক্ষদেবতা, আকাশদেবতা, তারাদেবতা, অশুভ শক্তি সূচক ভূত পিশাচ গবলিন প্রভৃতি, বৃক্ষদেবতা, নদীর ঝড়ের দেবতা, রোগপীড়ার দেবতা, ধাতু ও নির্মাণের দেবতা (ভালক্যান-বিশ্বকর্মা), ঔষধের দেবতা (অশ্বিনীকুমারদ্বয়)—এগুলি দ্বারা সূচিত হল বহু-দেববাদ। আমরা পরবর্তী যুগ বা অসভ্যযুগে প্রবেশ-কালে পরিপূর্ণ দেবসমাজ বা প্যানথিয়ন পেয়ে যাচ্ছি। একেশ্বরবাদ তখনও অজানা।

একটা কথা বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানববননের উষাকালে অথবা সেদিনের আদিম গোধূলিলগ্নে এসব চিন্তাভাবনা অস্পষ্ট ছিল, কল্পনাময় ছিল। তার পরিষ্কৃত রূপ দেবার মতো সমাজজীবনও রূপলাভ করে নি। সেই কারণে

আমাদেরও খুব সন্তর্পণে এই পিছিয়ে-যাওয়া সময়টাকে চিন্তার মধ্যে আনতে অগ্রসর হতে হয়। ছোটো-ছোটো দল, উপদল, কৌম, বিধিনিষেধ, আচার-আচরণ, খাদ্যগ্রহণ এবং বর্জন—এর সবগুলিই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিহ্বল চেতনার মধ্যে মিশ্রিত হয়ে থাকত বলাই ভালো। কল্পনা আর সত্যের মধ্যে খুব বিভেদ থাকত না। বিভেদ থাকত না সত্য আর মিথ্যার মধ্যে—অথবা শুভ শক্তি তথা অশুভ শক্তির মধ্যে অনেক সময় কল্পনা করা হত প্রতি ব্যক্তিরই একটা আশ্রয়দাতা শক্তি আছে—আবার অশুভ শক্তির ছায়াও তাকে বিভ্রান্ত করে। বস্তুত সে সময় মরাল কনশাসনেস ছিল বহুলাংশে বহিরঙ্গ এবং ভয়জনিত মেনে নেওয়া। এর মধ্যেই ছিল ধর্মজীবন। তথা ধর্মীয় নিয়মপালন। সামাজিক বিকাশধারার মধ্যে কী ভাবে উক্ত বহিরঙ্গ মরাল কনশাসনেস-এর সঙ্গে পৃথিবীভূত কনসেন্স বা ব্যক্তিবিবেকের উদ্ভব হল, তার আমরা কোনো সদুত্তর পাই না। কিন্তু এই বোধটির উৎপত্তির সঙ্গে-সঙ্গে ধর্ম ও নীতি দুটো একদিকে একত্র হল। আবার দুটোর ক্ষেত্র যে পৃথক, তারও নির্ণয় হল আরও কিছু পরে। প্রথম ক্ষেত্রে ধর্ম হিংসাত্মক হতে পারত (যা এখনও পারে)। শত্রুকে শেষ করা ধর্ম। ধর্মের জন্য বা স্বরক্ষার জন্য একদল অন্যদলকে, এক দেশ অন্য দেশকে নিঃশেষ নিরমূল করতে পারে—সেও ধর্ম—(যেমনটি পরবর্তী কালে মহাভারতযুদ্ধে দৃশ্যমান, অথবা আধুনিক কালে হিটলারের নাৎসিবধের ধর্মেও সুপ্রকট)। মৃত আত্মার জন্য মানুষবধ পশুবধ (কুরবানি, পশুযজ্ঞ, গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ-এর উদাহরণ আছে) তো ছিলই। স্বয়ং মহাশক্তিধর কোনো সত্তার তৃপ্তির জন্যও সেরূপ বলি প্রদত্ত হত। অনেক সময় কল্পনা করা হত যে ওই পশুটি যেন নিজসত্তারই প্রতীক। এবং ওই পশুর জন্য কোনো-কোনো ধর্মমতে (হিন্দু) অথণ্ড স্বর্গবাসের ব্যবস্থা আছে। (চার্বাকগণ তা খণ্ডন করেন; বলেন অক্ষয়

স্বর্গবাস তবে বৃদ্ধ পিতার পক্ষেই বলি হবার প্রশস্ত বিধান সঙ্গত)।

পূর্বোক্ত আলোচনার ক্ষেত্রে ধর্মানুষঙ্গের এই উপাদানগুলির একত্রীকরণ একদিনে হয় নি। ধর্মানুষঙ্গে একই কালে একই সূত্রে অতি স্থূল ও পরবর্তী কালে অতীব সূক্ষ্ম চেতনার সমাবেশ হয়ে থাকবে। স্তরগুলি তবুও চিহ্নিত করা যায়। যে আলোকে এ স্তরগুলি চেনা যায় সেটিকে আমরা স্বীয় আত্মপ্রক্ষেপণ বা সেলফ-প্রোজেকশন বলতে পারি। অর্থাৎ মানুষ যে পরিবেশে নির্মিত হয়েছে—তদনুযায়ী তার চিন্তার সামর্থ্য সীমিত হয়েছে। সেই সীমিত মানবচেতনায় সে মানুষের দেবতাও তেমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উদাহরণ ভূরি-ভূরি পাওয়া যায়। বৃষশক্তিকে মানুষ স্বীকৃতি দিয়েছে ক্রীট দ্বীপে, ভূমধ্যসহাসাগরীয় উপকূল-দেশগুলিতে এবং ঈজিপ্টে তথা পূর্বাঞ্চলে মেসোপটেমিয়া এবং হরপ্পা পর্যন্ত বৃষপর্ব বর্তমান। শিবের নন্দী বৃষ এবং বলবীর্য-সূচক। সর্প বা নাগপূজার জন্য জীবন্ত মানুষও আফ্রিকাতে বলি দেওয়া হত। কুমিরও সেভাবে পূজা পেত। ভারত উপমহাদেশে ভয়ের কারণে কুমির, বাঘ ও সাপ পূজিত হয়—(কালু রায়, দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাজী, বনবিবি সকলেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা স্বীকৃত—কারণ ভয়টা জীবিকার দায়ের ও প্রাণের)। গ্রামাঞ্চলে আজও নাগপূজার বিধান আছে। বৃষকপি বা হনুমানের পূজা উত্তর ভারতে প্রবলভাবে প্রচলিত। রাম অথবা রামের বাহনের মধ্যে রামের বাহন সমধিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। এই বৃষকপির পূজা চীন-জাপানেও সম্ভবত প্রসারিত হয়েছিল একসময়। পরবর্তী কালে অর্থাৎ অসভ্য যুগে এবং তারও পরে বর্বর যুগে আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত প্যানথিয়ন অথবা দেবসমাজ পাই। তা মানবসমাজ-চেতনার প্রক্ষেপ বা প্রোজেকশন। দেবতারাও প্রতিহিংসাপরায়ণ—তাঁরা শুধু দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন না। তাঁরা ভক্তাশ্রিত এবং সেইমতো শিষ্টেষ্টনির্বিশেষে আশ্রিত প্রতিপালন করেন। পূজা পান ও পেতে চান (শিবপূজক চাঁদবেনের মনসাপূজা সহজে সম্ভব হয় নি—মনসা অতি তৎপর ছিলেন সেজন্য)। দেবতারা মোটেও প্রতিপক্ষ সহ্য করতে পারেন না—যেমন জুপিটর সাজা দেন মানবের হিতার্থী অগ্নি-আনয়নকারী প্রমেথিয়ুসকে। বৈদিক ও হিন্দু দেবতাগণ দৈত্য-অসুর-দানবদের প্রবল প্রতিপক্ষ। অমৃতের অধিকারী দেবতারা অসুরদের পাতালে পালাতে বাধ্য করেন। অর্থাৎ যেমন-যেমন মানুষ স্বীয় শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে তার দেবতারাও তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন।

ইতিহাস

(২) সংগ্রহণ:

আমরা পূর্বোক্ত দেবসমাজের এরূপ একটা কাঠামো বা পরিচয় সমগ্র অসভ্য যুগ এবং বর্বর যুগ পর্যন্ত পেয়ে থাকি। দেবতারা গুণবান। প্রয়োজনে নিষ্ঠুর, হত্যাকারী, কপট ও শঠতাসহ হত্যাকারীও বটে। মানুষও তাই। তবে মানুষকে তো পরিশ্রম করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, বাঁচার উপকরণ তৈয়ারি করতে হয়। এটা কষ্টসাপেক্ষ। সুতরাং দেবতাদের সম্বন্ধে কল্পনা হল তাঁদের শ্রমের প্রয়োজনই নেই। স্বর্গসুখ বেহেশত অপ্সরা পরী হুরী, শ্রমহীন খাদ্য ও বিরামসূচক পরিবেশে তাঁরা সতত সন্নিবিষ্ট। এই অবস্থান মানব মননের ও চেতনার একটা নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে সমুৎপন্ন তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। দেবতা ও মানুষরা এখন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। মাঝখানে কোনো কোনো মধ্যবর্গীয় প্রতিপক্ষ কল্পিত হয়েছে—সেসব দৈত্য দানব অসুরও হতে পারে; গন্ধর্ব-যক্ষ-ঋভুও হতে পারে; দেবদূত অ্যানজেল হওয়াও সম্ভব। আবার তারা দেবরোষের পাত্র নহুষ হতে পারে—স্খলিতচরিত্র দেবদূত লুসিফার। পরে ইব্লিশ বা শয়তান বা ডেভিল হতে পারে। চমৎকৃত

হতে হয় দেবলোকে দেবসমাজের অধিবাসিগণ পত্নী-পুত্রকন্যাসহ সুখাসীন—পত্নীরা অনেকাংশে প্রায় কলহপ্রবণ। পুত্রকন্যাগণও রেষারেষি করে থাকেন। আর দেবতাদেরও এখন আপন-আপন বাহন পশুও নির্দিষ্ট হয়। গ্রীক প্যান্থিয়নে দেবতাদের প্রিয় পশু আছে। কোনো কোনো দেবতা ও পশু সংমিশ্রিত—যেমন প্যান অথবা দেবতামানব সেনটর কাইরন—(অথবা মিশরীয় স্ফিংক্স) দেখা যায়। মেসোপোটেমীয় গিলগামেশ কাহিনী স্মরণীয়। অনুমান করি—প্রাক-ইসলাম কিছু দেবদেবীর কল্পনা এই অঞ্চল থেকে সেখানে গিয়েছিল। ডায়নার প্রিয় পশু কুকুর, মিনার্ভার পেচক। অপর দিকে হিন্দু প্যান্থিয়নে দেব-দেবীদের স্ব-স্ব বাহনও নির্দিষ্ট। শিবের বৃষ, দুর্গার সিংহ, নারায়ণের গরুড় এবং পৃথিবীব্যাপী যে কয়টি দেবসমাজ বা প্যানথিয়ন আছে সেসব দেবতাদেরও সহচারী বা সহকারী জন্তু-জানোয়ার পাওয়া যাবে। হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ আলোচনা করার সময় আমরা আবারও এই বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করার কথা ভাবব।

একটা কথা লক্ষ করার মতো। চার্ট ৩ দেখলে আমরা অনুভব না করে পারি না যে, ধর্মীয় উপাদান সংগ্রহ আর সেই উপাদানসমূহের পরিপাটি অবস্থান একদিনে বা একভাবে হয় নি। মানবসমাজের আলোড়ন-আন্দোলন, উদয় আর বিলয়ের সঙ্গে তার একটা যোগ আছে। হিংস্র মানুষ যদি কল্পনায় হিংস্র পশু দেখে ভীত হয়ে থাকে, হিংস্র কোনো উগ্র প্রতাপের আশ্রয়কে সে দেবতা মনে করেছে। যদি সে মূর্তি গড়ে থাকে, তবে সে মূর্তির নখ দাঁত বাঘ-সিংহ-কুমিরের মতো হওয়া সম্ভব। মূর্তিগুলি স্বভাবত স্থূল বৃহৎ কর্কশ অথবা সবই হতে পারে। ঈস্টার আইল্যানডে মূর্তি সুবৃহৎ। ভারতে মন্দিরগুলি সুবৃহৎ ও সুন্দর। আরব দেশগুলির মসজিদ অতি সুনিপুণ-ভাবে সদলঙ্কৃত। মোঙ্গল তুর্ক তাতার দেশের মসজিদও অতি সুন্দর। ইয়োরোপীয় উপাসনাগারগুলি ছুরকম ভাবেই সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু তার মধ্যে তুর্ক বাইজানটিনরীতি এবং কিছু গথিক রীতিতে নির্মিত। অবশ্য এসবের আবির্ভাব অনেক পরের কথা। তবু প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হল এজন্য যে মানুষ যেমন সংস্কৃতমান হয়েছে, তার পরিচয়ও তার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানে বিধৃত হয়ে আছে।

পূর্বোক্ত আলোচনায় লেখক হিসাবে আমার অনুরোধ পাঠক যেন এটা প্রসঙ্গচ্যুতি বলে না মনে করেন। ইতিহাসপদ্ধতির সহজ সরল উপায় দিয়ে ধর্মের ধাপগুলি অন্তত ধরার উপায় নেই। তবু যে আমরা ইয়োরোপীয় সমাজব্যবস্থার একটা ছক ধরে অগ্রসর হয়েছি, সেটাও কিছু অবহেলার বস্তু নয়। বরঞ্চ এই পদ্ধতির সঙ্গে আমরা টয়েনবির "স্টাডিজ অব হিস্টরি" গ্রন্থে যা পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে তার কিছুটা জোড়াতালি দিয়ে নিতে পারি। তাতে বোঝার সুবিধা হয় এইজন্য যে, যখন আমরা একটা ইতিহাসের ধাপ শেষ করি, সেটা কিন্তু নিঃশেষে মুছে যায় না। তার সঙ্গে আগে পরে সঙ্গতি রেখে পরের ধাপটির প্রস্তুতি নির্মিত হয়—কিছু বাদ যায়, কিছু থেকে যায়। আবার কিছু নূতন সংযোজন হয়। সুতরাং ভয়ঙ্কর, স্বসম্মোহন, নতিস্বীকার, অনুকরণ, প্রক্ষেপণ, পায়ে-পায়ে অসঙ্গতি ও স্খলিত হবার অসহায়তা এসবই রইল। তারও উপর যুক্ত হল টোটেম ও ট্যাবু। তারও উপরে এসে গেল অ্যানিমিজম ফেটিশিজম এবং সর্বত্র শক্তিমত্তার একটা অনুভূতি চেতনা। এল দেবসমাজ।

এই দেবসমাজ বা প্যানথিয়নের দেবতারা মানুষের মতোই হিংস্র শাসক, খাদক এবং পক্ষপাতী সহায়কও বটে। এর থেকে অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এতদবস্থায় মানুষেরা ওইরকম স্তরেই ছিল। এতদিন ধরে মানুষ যে অবস্থায় বাস করত, এখন তাদের একটু বসবাসের আর খাদ্যের উন্নতি হয়েছে। একটু সুরক্ষা বা সিকিউরিটিও তারা বোধ করছে, সমাজের বিন্যাসে এসেছে সংহতি। মানুষের হাতে শুধু হাতিয়ার আসে নি—সে হাতিয়ার তৈরি করছে এবং বোধ করি বিশ্বকর্মা

বা ভালক্যানের মতো দেবতার কথা ভাবছে। গ্রামীণ জীবনে দেবতাদেরও বাসস্থান হয়েছে—বিশেষভাবে কিছু মানুষ তৈরি হয়েছে দেবসেবক হিসাবে। সেই সেবকগণ বিশেষ সুবিধাভোগী। পূর্বোক্ত আলোচনায় বলে এসেছি—গ্রামীণ দলপতি, গ্রামীণ বৈদ্য বা ওঝা আর পুরোহিত আবির্ভূত হয়েছে। কখনও তারা এক, কখনও তিন। কিন্তু তাদের মধ্যে বা তাদের কাজের মধ্যে একটা সঙ্গতি বিদ্যমান। সম্ভবত এ সঙ্গতিও তাদের সুরক্ষার জন্যই।

মানুষ অগ্নিদেবতাকে যখন কাজে লাগাতে পারল, তখন থেকে সে ইট পোড়াল, ধাতু গলাল। শুধুমাত্র রান্নার কাজেই অগ্নির ব্যবহার হল না। মানুষ কৃতজ্ঞ হল—অন্তত সেই কৃতজ্ঞতাসহকারে তারা ধর্মকে সামাজিক সংস্থা বা ইনস্টিট্যুশন বলে গ্রহণ করল। ধর্মের নামে হিংসা করা চলত—হিংস্র মানুষ পশুবলিও দিত, নরবলিও দিত অনায়াসে। বস্তুত পূর্বের প্রিমিটিভ কমিউনিজমের একটা অস্পষ্ট ছায়াকৃতি সমাজ পার হয়ে মানুষ অসভ্য যুগের স্তরে—কী বলব—উন্নীত হল। এখন তাদের প্রধান কাজ দল বাড়ানো—দল বাড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে আশেপাশের অন্যান্য দলকে পর্যুদস্ত করে সেই-সেই স্থানগুলি অধিকার করাও হল। বিজিত মানুষেরা অপরিসীম বেদনাসহকারে যন্ত্রণা সহ্য করে, পূর্বস্থিতি হারিয়ে বিজয়ীদের কবলে এসে পড়ল। এর মধ্য দিয়ে জাগল অসহায় মানুষের পশুবলকে মেনে নেওয়া এবং সেই পরাজিত লাঞ্ছনার মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজা—এই অদৃষ্ট।

এই অদৃষ্টবাদ বা অজ্ঞাত ভয়কে জ্ঞানগোচরে যে বিজিত মানুষ গ্রহণ করল, সেটা সহজ হয় নি। ধর্মীয় ভয়ভাবনা বিজিত ও বিজয়ী উভয়েরই রয়ে গেছে। অতএব বিজয়ী দল বিজিতকে হত্যা করলেও দেবতাকে গ্রহণ না করে পারত না। অপরপক্ষে, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিজিত দলও নূতন দেবতার পূজা-উৎসবকে মেনে নিত। ভালোবেসে না হলেও ভয়ে ও তরবারির সঙ্কেতে। বলা বাহুল্য, তরবারিও পূজা পেতে পারত। অসভ্য যুগের শেষ দিকটাতে মনে হয় বিভিন্ন ধাতুর স্তর পার হয়ে মানুষ তখন লৌহ গলাতে পেরেছে। লোহার শক্তিও অনুভব করেছে। জানি না লৌহধাতুই পরবর্তী কালের 'বজ্র' কিনা। সমাজব্যবস্থার সাথে-সাথে মানুষ হলধারী আর চক্রধারী হয়েছে—তাদের দেবতাদের বাহন হয়েছে পশুসমন্বিত রথ—হাতে উঠেছে হল নয়তো চক্র। এরূপ হলধর বা চক্রধর দেবতা আমাদের অজানা নয়।

বিভিন্ন দেশ বিজিত হল—মানুষে-মানুষে পরিচয় বাড়ল। অনতিক্রম্য নিয়মে একদিকে সেই পরিচয় হল রক্তস্রাত, আবার অপরদিকে হল পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ। সেইমতো দেবদেবীদেরও চারণভূমি প্রশস্ততর হল। গ্রামীণ জীবনে দেখা দিল হলকর্ষণ। আরও পূর্বকার যে পশুপালন ও পশুচারণ ছিল, তার থেকেই খাদ্য জুটত। সেই পশু দিত দুধ আর মাংস এবং শীতনিবারক চর্মচ্ছদও। এখন দেখা গেল পশু নিয়ে তাদের খাওয়াবার জন্য কেবল ঘুরে বেড়াবার চাইতে উৎকৃষ্টতর উপায় হল হলকর্ষণ আর শস্য জন্মানো। এর জন্য দরকার জল। নদীর ধারেই তাই বড়ো উপনিবেশগুলি গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে আরও একটা নূতন ব্যবস্থা দেখা দিল। এও আদিম সমাজেরই বিলম্বিত লয়ে প্রাপ্ত একটি অভ্যুদয়। এ অভ্যুদয় নারীর। নারীকে জননী বলে চেনা গেল। জননী দ্বারা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, এবং প্রজন্মপরম্পরা বজায় রাখতে হলে জননী অনিবার্য। তৎকালে ঠিক কখন যে নারীর গর্ভধারণে পুরুষের প্রয়োজন—একথাটা বোঝা গিয়েছিল, তা আজ বলা শক্ত। তবে মায়ের গর্ভজাত শিশুদের জানা যেত। সেই নারীকে উর্বরা শক্তির উৎস ধরা হল। নারী একটা অবস্থায় দলনেত্রী হল। নারীই বীজ বপন করত, সে নিজেও উর্বরা। বস্তুত নারীই কিন্তু তার জল বা খাদ্য সংগ্রহের পথে বৎসরের পর

বৎসর লক্ষ করে নিয়মিত ফুল ফল দানাশস্যের আবির্ভাব। এবং তার ফলে সে একটু সম্মানিতের আসনে গৃহীত হল। এই সমাজের রূপ হয়তো প্রথমে মাতৃপ্রধান ছিল—নেত্রীনারী শিকার করত—খাদ্য ভাগ করত। হলকর্ষণ আর বীজবপন সমান শ্রমের কাজ নয়। হলকর্ষণের ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাগ্রসর হল নারীকে হটিয়ে। কিন্তু এখানেও কাজ করল সেই পূর্বকথিত অতিরিক্ত নীতি বা এক্সেস প্রিন্সিপল। নারীকে শক্তি মেনে, ঋতুমতী ও গর্ভিণী নারীকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করে পূজ্য করে তোলা হল। প্রসঙ্গত আরও একটু কথা এখানে বলা দরকার। সেটুকু হল রক্তসংক্রান্ত একটা চেতনা। রক্তপাত মৃতের রক্ত বা মরণসূচক : গর্ভিণীর রক্তপাত বা ঋতুমতী নারীর রক্ত দেখা গেল প্রজনন সংক্রান্ত। তার থেকে নব প্রাণ আসে। রক্তের মাহাত্ম্য বেড়ে গেল—কাঁচা মাংস না হোক কাঁচা রক্তপান আদিম মানুষ দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস রেখে এসেছে। (এখনও তা কোথাও-কোথাও বর্তমান।) এই বোধ থেকে মানুষ ভাবতে শিখল দেবতাও রক্তপ্রিয় এবং রক্তপায়ী। বলি বা কুরবানির পিছনে এ মনোভাব থাকা সম্ভব। এখানেও সেই এক প্রক্ষেপ বা প্রজেকশন সূত্র কাজ করে থাকবে। মানুষ রক্তকে মূল্যবান ভেবে পরে দেবতাকে তা দিতে শিখল। তার সঙ্গে অবশ্যই জড়িত থেকে গেল প্রাচীনতর ও আদিমতর হিংসার হিংস্রতা—এই জান্তব রক্তপিপাসা নিয়ে সে পশুপাখি মানুষ সবই ধর্মার্থে হত্যা যে করতে পারত এমন একটা বিশ্বাস তার মনে জেগেছিল। বস্তুত অসভ্য যুগের একটা প্রধান ব্যাপারই ছিল প্রবল নিষ্ঠুরতা। জীবন্ত বলিপ্রদত্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড বার করে পুরোহিত মেক্সিকোর দেবতাকে নিবেদন করার চিত্র দেখা যায়--তেমনই উৎসবপ্রমত্ত মানুষের কানে বলির পশুর জীবনান্তক আর্তনাদ পৌঁছয় না, অথবা পৌঁছলেও তা ধর্মের জয়ধ্বনিতে চাপা পড়ে। আজও অনেক মানুষ বৃথামাংস খায় না। আর, পূর্বোক্ত নারীপূজার বা নারীপ্রশস্তির ক্ষেত্রে কোথাও দেখা দিয়েছে তন্ত্রোপাসনার বামাচার। এটা যুক্ত হয়েছে বহুপ্রচলিত ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে। আবার কোথাও-কোথাও সেটা রূপ নিয়েছে সম্পূর্ণভাবে স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সহজ যৌন মিলনের বিরোধিতায়। এটা বিশেষ করে তথাকথিত সাধনজীবনে আজকের দিনেও অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। আর, তারই সঙ্গে পাশাপাশি এমন দেবতার কল্পনা করা চলে অথবা মহাপুরুষের লক্ষণ বলে ধরা হয় যার সঙ্গে বহু নারীর যৌন সম্পর্ক অথবা বহুপত্নীকতা বর্তমান। হয়তো এক কালে সামাজিক জীবনে বহুপত্নীর প্রয়োজন ছিল অধিক সন্তান ফলনের জন্য। তার যখন প্রয়োজন রইল না তখনও সেই এক্সেস প্রিন্সিপল্ সক্রিয় হয়ে থাকল। নারীর বহুগামিতা নিন্দনীয় হল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। অথচ পুরুষের বহুচারিতা নিন্দনীয় হল না। বরঞ্চ ধার্মিক পুরুষের আশ্রয়ে, বীরপুরুষের আশ্রয়ে বহুনারীর একত্র হওয়ার ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হল। মহাভারতের কৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নী ছিলেন। তাঁর প্রাক্‌পূর্বে সহস্র গোপিনী তাঁকে ভজনা করত। অপর দিকে দেখা যায়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসজীবন নারীবিবর্জিত করা হয়েছে। সেখানে কোনো না কোনো ছিদ্রপথে নারীসম্ভোগ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে অবলোকন করা যায়। আর প্রথমটির ক্ষেত্রে তন্ত্রসাধনার ভৈরবী, বৈষ্ণব-আখড়ার বৈষ্ণবী—এগুলির মধ্যে অনাচার ব্যভিচার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে লক্ষিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় ধর্ম আলোচনা করার সময়ে আবারও ফিরে আসব। আমরা মনে করি, ফলত স্ত্রী-পুরুষ সংক্রান্ত এইসব সম্পর্ক নিয়ে একটা গুহ্যতত্ত্বম গড়ে তোলা হয়েছিল।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো। আমরা মনে করি, মানসিক ভাবে জড়, অবসাদগ্রস্ত অথবা এপিলেপটিক রোগী এবং হাবা-কালা বা ন্যালাখ্যাপা মানব বা মানবী এখনকার মতো আগেও ছিল।

সাধারণ বুদ্ধিতে এরা দুর্বোধ্য। এদের অবস্থাকে মনে হয় প্রাচীন ও আদিম জীবনে (এখনও তা নেই বলা যায় না) একটা ধর্মীয় আবরণ দেওয়া হত। কোথাও হিসটেরিয়া রোগীকে দেবতার ভর হয়েছে, বা ভূতে পেয়েছে বলে সেইমতো আচরণও করা হত। পাগলকে কষ্ট দেয়া হত। ভূতে-পাওয়া এবং ভগবানে-পাওয়া মানুষের বাহ্যাবস্থা একরকম হলেও উভয়-ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হত পৃথক। সম্ভ্রম ও বিভ্রম—দুই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা আধ্যাত্মিক কল্পনাকে সত্য মানা হত।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা কিছু আলোচনা করে এসেছি তা তিনটি প্রধান স্তরে ফেলে বিচার করা সম্ভব। প্রথমটি হল আহরণ, দ্বিতীয়টি হল সংগ্রহণ, এবং তৃতীয়টি হল পরিগ্রহণ। প্রথম দুটি চার্টের সাহায্যে আমরা দেখেছি বহির্জগৎ কী ভাবে মানুষের অন্তরজগৎকে পরিপ্লুত করে এবং আচ্ছন্ন করে। যুক্তি এগিয়ে চলে সংশয়-নিশ্চয় বিচার করে। আচ্ছন্ন মানসিকতাও এগিয়ে চলে—তার সাথে চলে বিশ্বাস-প্রবণতার অন্ধতা এবং বিচারের অভাব। সেই পথেই চলে আহরণ এবং 'খ্যাপা খুঁজে-খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'। অন্যভাবে বলতে গেলে 'searching a black cat in a dark room where the cat is not.'

দ্বিতীয় অবস্থাটি হল অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হবার পথে অবশ্যম্ভাবী ক্রমোত্তরণের পথে পুরাতন এবং নূতন উপাদানের সংগ্রহণ তথা পরিরক্ষণও। মানবজীবন মানবজগৎ মানবমনন সতত সঞ্চরমাণ। তার স্বাভাবিক গতি হওয়া চাই সম্মুখপানে। সেটিই যুক্তির পথ, বুদ্ধির মুক্তির পথ। সংগ্রহণ-পরিরক্ষণ কিছুই বিচার করে না বা পরিবর্জন করে না। সেই-জন্য এই সংগ্রহণ একপ্রকার চক্ষুরোধ করে সম্পূর্ণ একটা পৃথক জগৎ গড়ে তুলে সেইখানে বিচরণের মধ্যে আয়াস বা আরাম খুঁজে পাওয়া—এটাকে এক-প্রকার এসকেপিজম বলা যায় কিনা তাও বিচার্য। তবে এইভাবে পথচলা আধুনিক মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে খানিকটা চিকিৎসাবিধি হিসাবে সঙ্গত বলে মনে করা যেতে পারে। যেমন কারো পুত্রশোক হয়েছে। সে মা বা পিতা হয়তো ভাগবত সত্তাকে পুত্রোপম কল্পনা করতে পারেন বা পুত্রকল্প ভোগরাগ সেবাও করে শান্তি পেতে পারেন। এটা সত্যের পথ নয় ঠিকই কিন্তু অসুস্থতাকে অসুস্থ এই কল্পনা দিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করা মাত্র।

যে কারণেই হোক, হলকর্ষণ করে কৃষিকার্য চালু হবার সঙ্গে-সঙ্গে নারীর অবস্থার একটা বড়ো অবনতি ঘটে। সেই অবনতির ফলে নারী তার স্বাধীনতা প্রায় সবটাই হারায়। সেটা সে আর ফিরিয়ে পায় নি। অন্তত এখনও পায় নি। যে কারণে তাকে বহুপতিত্ব মেনে নিতে হয়েছিল সেই একই কারণে তাকে কখনও সতী হতে হয়েছিল, কখনও বা তাকে জহরব্রতে ব্রতী হতে হয়েছিল। তাকে ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে শিখতে হয়েছিল তার নিজের সুখ-দুঃখ নেই, ধর্ম-অধর্মও নেই। এই তৃতীয় ঘটনাটি অবশ্য সংগ্রহণ-পরিরক্ষণের মধ্যে পড়ে যায়। মানুষ তখন বিচার করতে শিখেছে কী করবে এবং কেন করবে। নারীপুরুষ সম্পর্কিত ব্যাপারটা যখন বিবাহাস্তিক করে তোলা হল সেখানেও একটি ধর্মানুশাসনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। ধর্মের মধ্য দিয়ে অধর্মকে স্বীকার করে নেওয়াই এইপ্রকার নারী- নির্যাতন তথা- অবমাননার একটা দৃঢ় ভিত্তিমূল বলা যায়। এরই পাশাপাশি অসভ্য যুগ থেকে বর্বর তথা সামন্ত যুগ পর্যন্ত দেবদাসীপ্রথা (কুমারীপুজা অথবা ভোগারাধনা এখনও আছে) সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্যযুগীয় বর্বরতা যে সব দিক দিয়ে নিরমূল হয়েছে তা বলা যায় না।

সর্বশেষের অবস্থাটা পরিগ্রহণ। পরিগ্রহণ কথাটার মধ্যে বিচার-বিবেচনা কিছু আছে। প্রকৃত-পক্ষে এতদিনে বলা যায় ধর্মানুচরণের সোপানগুলি স্থিরীকৃত হয়েছিল বেশ একটা পদ্ধতি অনুসারে।

দীর্ঘ সহস্র লক্ষ কোটি বৎসরের চলে আসা ইতিহাস নুড়িপাথরের মতো কিছুটা নদী-স্রোতের মধ্যে তলিয়ে গেল। অথচ বহমান নদীর মতো ধর্মব্যবস্থা এবার মানবজীবনে ও সমাজজীবনে স্থান নিল। দেখা গেল, ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে একটা সুবিধা আছে এবং সেটা শাসনপদ্ধতিতেও সহায়ক। চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, নূতন পুরাতন ধর্মমত নষ্ট হচ্ছে আবার সৃষ্টিও হচ্ছে। প্রায় প্রতিটির উদয় এবং লয়ের সঙ্গে জড়িত থাকছে কিছু আন্দোলন আলোড়ন। সময়ও এগিয়ে আসছে ক্রমশ। ঈজিপ্ট-এর ইতিহাসে আমনপুজার স্থানে আটনপুজা থেকে শুরু করে ভারতে বৌদ্ধ-হিন্দু লড়াই, ইয়োরোপে সারাসেন-খ্রীষ্টানের লড়াই, ক্যাথলিক-কেলভিনিস্টের যুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাই-ই দেখা যাবে। এই সমস্ত ব্যাপারটা এবার ধর্মতত্ত্বের নাম কটিতে সাজিয়ে ফেলা যাবে। এর জন্য চার্ট তিন দ্রষ্টব্য। আহরণ, সংগ্রহণ, পরিগ্রহণ স্তরগুলিতে আমাদের জানা ধর্মতত্ত্বগুলিকে খানিকটা ইতিহাসের নিয়মেই ধরা যেতে পারে। ধর্মজিজ্ঞাসা তার উষাকালের প্রায়-অন্ধকার অবস্থা পেরিয়ে একটা আলোর উদ্ভাসের মধ্যে এসে পড়ল। "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" তার প্রথম স্তর পার হয়ে এখন দ্বিতীয় স্তরে এসে পৌঁছাল বোধগম্য হবার পথে। অজ্ঞান থেকে এল এখন জ্ঞান-অজ্ঞানের পরিবর্জন-পরিগ্রহণের পথে।

আলোচ্য নিবন্ধে সন্নিবদ্ধ চার্টগুলিতে আমি স্বেচ্ছায় ইংরাজি শব্দ রেখেছি। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝতে গেলে মোটামুটি যে ছক অনুসৃত হয় তা হল ইয়োরোপের ইতিহাসের গতির একটা পথরেখা। আমাদের দেশেও বিজ্ঞান ছিল। তার ইতিহাস প্রায় লুপ্ত এবং লুপ্তোদ্ধার সম্পূর্ণ হয় নি। অপর দিকে কোনো অজ্ঞাত কারণে এদেশে পুরাণ থাকলেও ৩২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে রেকর্ডেড তারিখও পাওয়া যায় না। বেদ উপনিষদ পাণিনি সকলকেই আনুমানিক তারিখের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতে হয়। ইতিহাস যা আছে তা মুসলিম পিরিয়ড থেকে মোটামুটি পরম্পরাগতভাবে পাওয়া যায়। পাণিনি পৃথিবীর প্রথমতম ভাষাতাত্ত্বিক তথা বৈয়াকরণ এবং অলবিরুনি পৃথিবীর প্রথমতম ভারত-তত্ত্ববিশারদ বলা সঙ্গত। অল্প কিছু ঐতিহাসিক উপাদান মেগাস্থিনিস, ফা-শিয়েন, শু-এনথ-জাং ইৎসিঙ এবং মুঘল দরবারের সঙ্গে সংযুক্ত বিদেশী কিছু পর্যটকের রচনায় মেলে (টলেমি ও প্লিনীর রচনায় অবশ্য ভারতের উল্লেখ আছে)। এই অবস্থায় বিদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এদেশের বিভিন্ন স্তরের উপাদানগুলি সাজিয়ে দেখার প্রয়াস অযৌক্তিক হবে না।

চার্ট ১ : ব্যক্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত

$\frac{I}{E}$ অর্থাৎ ব্যক্তি বা Individual এবং পারি-পার্শ্বিক বা Environment দুটি পরস্পর একান্ত-ভাবে সমৃক্ত। মাতৃগর্ভ থেকে এই এনভায়রনমেনট আমৃত্যু ব্যক্তির সত্তাকে ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট করে থাকে। যথা—

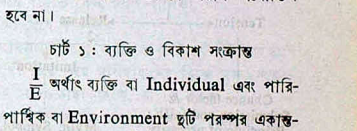

চার্ট ২(এ)

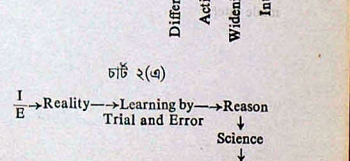

এখানে বুঝতে হবে ব্যক্তি ও এনভায়রনমেনট

মিলে একটা 'বাস্তব' প্রাপ্ত হচ্ছে। তার থেকে সে চেষ্টা করে জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে; যেমন শিশু আগুনে আকৃষ্ট হয়ে হাত বাড়ায়। হাতে তাপ লাগে। পুনর্বার সে আর তা করে না। এই জ্ঞানপ্রাপ্তি থেকে আহরণ করে যুক্তি বা রিজন—এটি বিজ্ঞানের পথ-প্রবেশিকা। এর থেকে জন্মলাভ করে বিজ্ঞান এবং বহুবিশিষ্ট বিজ্ঞান বা বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান। এই বৈশ্লেষিকী সাধনগুলির সমন্বয়কে বলা হয় দর্শন। এ হল ব্যক্তিবিকাশের একধরনের পথ। অন্যপথও আছে। যথা—

চার্ট ২ (বি)

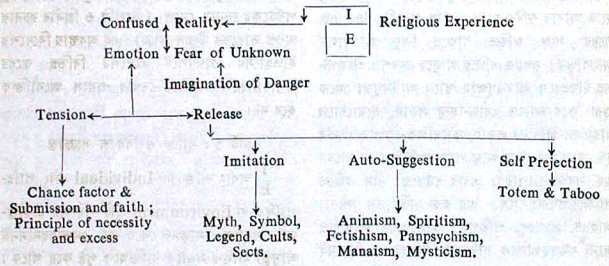

Conclusions from Chart No. 2(A) & (B)

Chart No. A shows the victory of the Individual over Environment and gives birth to Reason.

Chart No. B indicates submission of the Individual to the difficult environment and is followed by some kind of complex irrational experience recognised as faith. Thus, Reason and faith are contradictory to each other and remains wide apart. A scientific study of Religion, Philosophy of Religion, Religious Anthropology are the rational effects made later.

আমাদের গল্প

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আমরা এখানে আছি, এইখানে,
যেখানে সমস্ত বাড়ি হেলে পড়ছে বাইরের দিকে,
সমবায় মার্কেটে কাটা আড়মাছে ডুমো ডুমো মাছি,
আছি, আমরাও আছি
চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোনোমতে—
বাড়ি ফিরে এলে দোতলার ঝিম-ধরা বারান্দায়
একটি বোল্‌তা আসে প্রতিদিন, গর্জ্যমান কামানের মতো,
কে জাগে কে ঘুমিয়ে রয়েছে কে জাগে?
সন্তোষপুরের দিকে চলে যায় অন্ধকার রিক্‌শা লাফ দিয়ে।
মানুষের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে নাকি? বরাবরই
এরকম ছিলো এই বর্ধমান বিধুর স্বদেশে,
গা ঘেঁষে দাঁড়াও কেন, চপল বালিকা,
কেন গা ঘেঁষে দাঁড়াও?
মুখে জামরুল দিয়ে তুমি চাইছো প্রাইভেট টিউটরের সাথে
আহ্লাদী বিয়ে করে মুর্শিদাবাদের দিকে চলে যেতে—
তা কি হয় এতোটা সহজে, তা কি হয়?
আমরা যেখানে আছি যতোদূরে আছি যতোদূর
শুধু একটা লোহার বেড়া আমাদের আড়ালে রেখেছে—
ওপারে ধূমল ট্রেনে চলে যায় আমাদেরই আত্মীয়স্বজন॥

প্রখর তপনতাপে

পরিমল চক্রবর্তী

প্রখর তপনতাপে
কাঁপে মন, কাঁপে দেহ—দেহ কাঁপে আর মন কাঁপে ;
ধূসর দিগন্ত জুড়ে আর্ত বাসনার
তীব্র হাহাকার—
আর,
এলোমেলো শত ভাবনার
লঘুপক্ষ মেঘ ভাসে মনের আকাশে ;
আবিশ্বপরিধি ব্যেপে সব যেন পুড়ে যায় অগ্নি-দীর্ঘশ্বাসে :

দিগ্বিদিকে শুধু খরা, নেমে আসে খরা…
উত্তাল নদীর বুকে পড়ে গেছে চড়া ;
জল নেই, স্রোত নেই, নেই কোনো ঢেউ।
হায় সখি হায়, বলো, এল এ-কী দিন
সমস্ত শরীরে নিয়ে যৌবনের ঋণ
যখন ভালোবাসার গান শোনাব এমন কাছে নেই কেউ !!

পাহাড়ে, নদীকূলে, অ-সভ্যতায়

দাউদ হায়দার

আকাশ ঘনাল মেঘে পুবে ও পশ্চিমে
আমরা কজন ভয়ে জড়োসড়ো হিমে
উত্তুরে বাতাস কাঁপন লাগালো গায়ে
ছেঁড়া পাতলুন, জুতো নেই পায়ে।

চলেছি সুদূর দেশদেশান্তর,
কোথায় আবাস কোন্‌খানে বাড়িঘর
অজানা, সম্মুখে শান্তিপারাবার ?

'এই নদী হারবার
ছেড়ে দক্ষিণে যাও, বাংলার
মাঠপ্রান্তর পড়ে আছে, বুড়ো আংলার
মতো ঘুরে এসো, মনে হবে ঠিক
এও যেন বাংলার গ্রাম, তুমি নও বিদেশী পথিক'

আকাশ ঘনাল মেঘে, অদূরে পাহাড়—
কিছুক্ষণ আগেই বেলজিয়াম পার
হয়ে হল্যানডের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছি, সন্ধ্যায়
যেতে হবে লুক্‌সেমবুর্গ, 'অযথা আড্ডায়
সময় কাটিও না, বিয়ার নিয়েছ সঙ্গে, গোটা
দুই ডুরস্ট, হামবার্গার ?' বলে সেই মোটা
মেয়ে চুমু খায় বন্ধুর গালে। গির্জায়
ঢংঢং ধ্বনি ! কী আশ্চর্য, এখনো বসে আছ ? লজ্জায়
হেঁট হয় মাথা।' 'কেন ?' 'আজো তুমি রয়ে গেলে
উদাসীন। বৃতা আজ সন্তানসম্ভবা, ফিরে গেছে ব্রাজিলে'

আকাশ ঘনাল মেঘে, দূর দয়াহীন দেশে
দীর্ঘ যাত্রার বিরতি, মাঝখানে এসে,
সবকিছু দেখে নেওয়া ভালো
এই নিষ্প্রাণ শহরে ; রাজধানী এত কালো ?
পাথর কংক্রীট ছাড়া কিছু নেই, মনে হয়
ক্ষুধিত পাষাণ আর দেশ জুড়ে অবক্ষয়।'
'এই সভ্যতা মেনে নেবে ? শূন্যতা ছাড়া
কীই-বা আছে, অস্থির নাকাড়া

বাজিয়ে গান গাই 'হে প্রেম, হে শৃঙ্খল',
'হে দেশ, হে আন্তর্জাতিক কোলাহল',

বলি আমি, 'তাহলে ফেরা যাক' ; "কোথায় ?"
'পাহাড়ে, নদীকূলে, অ-সভ্যতায়'

ছোঁয়া

মতি মুখোপাধ্যায়

পদ্মকুঁড়ি ফুটে আছে কাকচক্ষু জলে নাকি বুকে
কিশোরী বোঝে না অত শত, প্রচলিত সংস্কারে
নিরিবিলি দীঘিতীরে সে এখন বসন খুলেছে
আশেপাশে আম জাম কাঁঠাল কি তাল নারকেল
যতটা সম্ভব তারা ছড়িয়েছে ঘেরাটোপ ছায়া
কিশোর পাখিরা আছে কিন্তু ওরা ভীষণ সরল
ছাখে না গোপন দেহ মানুষে যা কৌতূহলে খোঁজে
স্বভাবসঙ্গমরত হাঁসেরাও খুব উদাসীন
কিশোরী জানে না আজো বয়স্ক বেদনা কোন্‌খানে
কেনই বা ক্রোধে তারা রুধিরে রাঙায় দুই হাত
প্রণয় শেখে নি যারা জানে শুধু ধর্ষণকৌশলে
নারীর সুন্দর ছিঁড়ে পাপের বন্যায় ভেসে যেতে।

পাখির শিশুর মতো কিশোরীর এখনো বিস্ময়
এখনো ছোঁয় নি তাকে রক্তবাহী বিষ-বীজাণুরা
সে দেখেছে নীল পরী দিনরাত্রি যার দুই ডানা
উড়ে যায় ফিরে আসে সুন্দরের ছোঁয়া দেবে বলে।

ভারত-ইতিহাসে টিপু সুলতান

গৌতম নিয়োগী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত প্রয়াত অধ্যাপক ড. সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য-সংকলিত ও সম্পাদিত "এ ডিকশনারি অব ইনডিয়ান হিস্টরি" বইতে টিপু সুলতানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'ভারতের ইতিহাসের এক বিশেষ স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব'। (২য় সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ ৮৭৮)। ওই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই, থাকার নয়। ইতিহাসবিরোধী দ্বিমত নতুনভাবে মতলব হাসিল করবার জন্য গড়ে তুলতে চাইছেন কিছু উগ্র হিন্দু ব্যক্তি আর সংগঠন। আর তাঁদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্য হাজির করছেন ব্রিটিশ লেখকদের লেখা উদ্দেশ্যমূলক রচনাগুলি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে টিপু ছিলেন ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামী বীর যোদ্ধা। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি ইংরেজের পদলেহনকারী বন্ধু বা 'অধীনতামূলক' ভাবে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে চান নি, এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর প্রাণত্যাগ। অপর দিকে, টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধেই ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ডধারী রাজদণ্ড-লোভাতুর উগ্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের পোষা সারমেয়সুলভ আচরণ করেছিল ইসলাম-ধর্মাবলম্বী হায়দ্রাবাদের নিজাম আর হিন্দুধর্মাবলম্বী পুনার পেশওয়া দরবারের মারাঠারা। সুতরাং এখানে ধর্ম নয়, ইতিহাসে স্থাননিরূপণ হচ্ছে বিদেশী শক্তির সঙ্গে স্বদেশের মান ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের দ্বারা। ইতিহাসে তাই নিজামের বা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের ভূমিকা কালিমালিপ্ত, হায়দর আলি আর টিপু সুলতানের ভূমিকা গৌরবে উজ্জ্বল। আজ নিজামের বংশধরগণ ভারতের অন্যতম ধনী পরিবার, আর টিপুর বংশের উত্তরাধিকারীরা কেউ প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোডে ভাঙা বাড়ির বাসিন্দা, কেউ কলকাতার রাস্তায় রিকশাচালক। শুধু ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই টিপু সুলতানকে ভারতীয় ইতিহাসে অনন্য চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তা

কিন্তু নয়। ভাবনা-চিন্তায়, লেখাপড়ায়, রাজনৈতিক তত্ত্বের অনুশীলনে, এমনকী, তৎকালীন ইউরোপীয় ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক তত্ত্বাবলীর খোঁজখবর রাখার ক্ষেত্রে, নিজস্ব শাসনব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন যুগের অগ্রগামী। তাঁর ভাবনায় আর কর্মে অসঙ্গতি আর ত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল, পরিবেশ আর সমসাময়িক ব্যক্তিদের প্রতিকূলতা সেগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর পতন ঘটায়। তবে তা স্বীকার করেও বলা যায়—ইতিহাসের নিরিখে তিনি অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র। এই কথাটা আরেকটু বিশদ করে বুঝিয়ে বলার জন্যই এই প্রবন্ধ।

আকর-উপাদান ও ইতিহাস : সত্য ও পক্ষপাত

টিপু সুলতান-বিষয়ক সবচেয়ে ভালো আধুনিক গবেষণা, আমার মতে, ড. মহিবুল হাসান খানের "হিস্টরি অব টিপু সুলতান"। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ একসঙ্গে ঢাকা আর কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনে। পরে লেখক গ্রন্থটির পরিমার্জন আর পরিবর্ধন করেন; বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতার দ্য ওয়ার্ল্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় (১৯৭১)। আমার বর্তমান আলোচনার জন্য আমি এই সংস্করণটি ব্যবহার করেছি সবচাইতে বেশি। টিপু সম্বন্ধে আলোচনায় কলকাতা এবং শ্রীনগরের কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তন অধ্যাপক অসামান্য দক্ষতা, ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা এবং তথ্য-যুক্তি-প্রমাণসহযোগে নিষ্ঠাবান বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। মহিবুল হাসানের গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ঠিক এক বছর আগে (১৯৭০) ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডেনিস ফরেস্ট তাঁর "টাইগার অব মাইশোর, দ্য লাইফ অ্যানড ডেথ অব টিপু সুলতান" শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন লনডন থেকে। এটিও সুলিখিত এবং নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা, তবে টিপুর শাসন-প্রণালী এবং ধর্মনীতি বিষয়ে প্রামাণিক নয়; টিপুর পিতার শিক্ষা ও বাণিজ্য নীতি বিষয়ও কিছু লেখা নেই। মহীশূর-বিষয়ক আধুনিক গবেষণায় ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ প্রয়াত নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ। তাঁর "হায়দর আলি" নামক গ্রন্থটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৪১ এ। তৃতীয় সংস্করণ (১৯৫৯) পরিবর্ধিত আকারে। তারপর থেকে অদ্যাবধি গিদওয়ানির "দ্য সোর্ড অব টিপু সুলতান" বা শ্রীমতী এম. আরচার-লিখিত "টিপুস টাইগার" (লনডন, ১৯৫৯) ইত্যাদি উপন্যাসধর্মী লেখাগুলি সঙ্গতকারণে বাদ দিলেও কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থের কথা উল্লেখ করতেই হবে। যেমন, ড. আনতোনোভার "দ্য স্ট্রাগল অব টিপু সুলতান এগেনস্ট ব্রিটিশ কলোনিয়াল পাওয়ার" (মস্কো, ১৯৬২)। মস্কোর ওরিয়েনটাল ইনস্টিট্যুটের শ্রীমতী আনতোনোভা ফরাসিদের সঙ্গে টিপুর মৈত্রী বিষয় নতুন তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন। এ. সুব্বারায়া চেট্টি লিখেছেন "নিউ লাইট অন টিপু সুলতান" (সালেম, ১৯৬৭)। সুব্বারাও চেট্টির গ্রন্থটি অন্ধ্রপ্রদেশ ইতিহাস সংসদে পঠিত প্রবন্ধের বর্ধিত রূপ। টিপুর রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস বইটিতে খুবই মামুলি, তবে হিন্দুদের ও হিন্দু সংস্থাগুলির প্রতি টিপুর সাহায্য বিষয়ে বইটিতে বহু আলোচনা আছে। মূল প্রবন্ধটি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে যদুনাথ সরকার-সংগ্রহে দেখেছিলাম। এরপর প্রকাশিত হয় এম. এইচ. গোপালের "টিপু সুলতানস মাইশোর: অ্যান ইকনমিক স্টাডি" (বোম্বাই, ১৯৭১) এবং সি. কে. করিমের গবেষণা, "কেরালা আনডার হায়দর আলি অ্যানড টিপু সুলতান", (কোচিন, ১৯৭৩) যাতে লেখক সর্বপ্রথম মালয়ালাম ভাষার সূত্রগুলি ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। ড. নিখিলেশ গুহর গবেষণা "প্রি-ব্রিটিশ স্টেট সিস্টেম ইন সাউথ ইনডিয়া: মাইশোর ১৭৬১-১৭৯৯" (কলকাতা, ১৯৮৫) উল্লেখ্য। ড. গুহর সুলিখিত গ্রন্থটিও আমার বেশ কাজে লেগেছে।

আধুনিক এইসব লেখকদের রচনা বাদ দিলে

টিপুর সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক প্রাথমিক আকর-উপাদানগুলি দু ধরনের। ফারসি এবং ইংরিজি। ফারসি কিতাবগুলি স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং সে বিষয়ে দু-চার কথা বলা দরকার। প্রথমেই উল্লেখ্য "নিশান-ই-হায়দরি", যার লেখক হুসেন আলি খান কিরমানি। কলকাতার তদানীন্তন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এ রক্ষিত কিরমানির পাণ্ডুলিপির ইংরিজি অনুবাদ করেছিলেন কর্নেল ডবলু. মাইলস দু খণ্ডে। প্রথম খণ্ডের নাম "দ্য হিস্টরি অব হায়দর নায়েক" (লনডন, ১৮৪২) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "দ্য হিস্টরি অব দ্য রেইন অব টিপু সুলতান" (লনডন, ১৮৬৪)। মহিবুল হাসানের মতে, অনুবাদ সর্বদা বিশ্বস্ত নয়। কিরমানি ছিলেন টিপুর সভাসদ, তারও আগে হায়দর আলির কর্মচারী। শ্রীরঙ্গপত্তমের পতনের পর তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলকাতায় প্রেরিত হয়ে পরে ইংরেজদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় বইটি লেখেন। স্বভাবতই তিনি ইংরেজদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ। তাঁর সন-তারিখ সর্বদা নির্ভুল নয়, ঘটনাপরম্পরাও সঠিক নয়; টিপুর শাসন বা সৈন্যসংগঠন সম্বন্ধে কম কথাই লিখেছেন। টিপুর চরিত্রকে তিনি ধর্মান্ধ সাজিয়েছেন, কারণ তিনি নিজেও ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। তাঁর মতে, ইসলামধর্মপ্রচারই টিপুর মূলমন্ত্র। এই ত্রুটিগুলি ছাড়া তাঁর বই খুবই তথ্যবহুল এবং খুব কাছ থেকে দেখা বলে গুরুত্বপূর্ণ। আমি অবশ্য কিরমানির যে সংস্করণটি ব্যবহার করেছি, তা কলকাতা থেকে প্রকাশিত (১৯৫৮) মাইলস-এর অনুবাদের পুনর্মুদ্রণই, নাম "হিস্টরি অব টিপু সুলতান"। অন্যান্য ফারসি বইগুলির মধ্যে "তারিখ-ই-টিপুসুলতান", "সুলতান-উত্-তাওয়ারিখ" এবং "তারিখ-ই-খুদাদাদি"-র লেখকদের নাম জানা যায় না। প্রথমোক্ত দুটি মূল্যবান। এ ছাড়া হামিদ খানের "তারিখ-ই-হামিদ খান", হুসেন খান লোহানীর "তারিখ-ই-কুর্গ", লেখকের নামহীন "ওয়াকিয়া-ই-মঞ্জিল-ই-রাস", জৈনুল আবেদিন-এর "ফুত্-উল মুজাহিদিন", মীর আলমের "হাদিকাত-উল আলম" এবং টিপুর "হুকুমনামা" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন টিপু সুলতানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। ফলে, তাঁদের লেখায় সুলতান চিত্রিত হয়েছেন ধর্মান্ধরূপে এবং বন্দী সৈন্যদের প্রতি নিষ্ঠুর মানুষরূপে। যেমন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ফারসি ভাষার অধ্যাপক উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক অনূদিত "সিলেক্ট লেটারস অব টিপু সুলতান" (লনডন, ১৮১১) বইতে প্রতিটি চিঠির সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য। চিঠিগুলি দরকারি, তবে কিছু জাল চিঠিও থাকতে পারে। সৈন্যবাহিনীর লোক বা তাদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের টিপুর প্রতি ক্রোধ স্বাভাবিক, পক্ষপাতও স্বাভাবিক। এ. অ্যালান, এডওয়ার্ড মুর, এ. বীটসন, মেজর এ-ডিরম, আর ম্যাকেঞ্জি, ইন্স্ মানরো, এ. ম্যাকলিয়ড, জে. স্যালমণ্ড প্রমুখ কত লেখক আছেন প্রাক্তন সৈনিক। ইংরেজ জাতির এই ইতিহাস লিখে রাখার প্রবণতা প্রশংসনীয় গুণ, আমাদের তা ছিল না স্বীকার্য, তবে লিখলেই তো হয় না যদি নিরপেক্ষতা না থাকে। আর আশ্চর্য হতে হয় যখন ইতিহাসবিদ বা সরকারি নথি-লেখক সেইসব কথা স্মৃতিচিত্রণ বেমালুম সত্যি ধরে নেন। তখন ইতিহাসও বিকৃত হয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চায় আমরা দেখি অনেকেই টিপু সুলতানের প্রতি সুবিচার করেন নি। মহীশূরের সবটাইতে বিস্তারিত ইতিহাস লিখেছেন মার্ক উইলকস ("হিস্টরিক্যাল স্কেচেস অব দ্য সাউথ অব ইনডিয়া ইন অ্যাটেম্‌ট টু ট্রেস দ্য হিস্টরি অব মাইশোর", তিন খণ্ড, লনডন, ১৮১০-১৮১৭)। আমি অবশ্য গ্রন্থটির অন্য সংস্করণ দেখেছি, যা জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত দ্বিতীয় সংস্করণ (মারে হ্যামিক-সম্পাদিত, দু খণ্ডে, ব্যাঙ্গালোর, ১৯৩০)। সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের রচনার কয়েকটি নিদর্শন :

P. Auber, *Rise and Progress of the British Power in India*, 2 vols, Lond. 1837; John Malcolm, *The Political Histoty of India from 1784 to 1823*, 2 vols, Lond, 1826; Henry Beveridge, *A Comprehensive History of* India, vol II, Lond, 1867; L. B. Bowring, *Haidar Ali and Tipu Sultan*, (Rulers of India Series), Oxford, 1893; James Mill, *The History of British India* ed. H. H. Wilson., vol VI, Lond, 1840; A. W. Lawrence, *Captives of Tipu Sultan*, Lond, 1929; J. R. Anderson, *The Coins of Haider Ali and Tipu Sultan*, Madras, 1921; E, Thronton, *A History of British* Empire in India, vols II-III, Lond, 1842; G. B. Malleson, *Seringapatam Past and Present*, Madras, 1876; E. Thompson & G. T. Garrat, *Rise and Fulfilment of British Rule in India* ইত্যাদি।

এছাড়া রয়েছে অন্যান্য সরকারি নথি, যেমন গেজেটিয়ার (থর্নটন, রাইস, ইন্স্ প্রমুখের) এবং সেনসাস (লিনডসে, রাইস প্রমুখের) যেগুলিতে পূর্বতন ইতিহাস স্থান পেয়েছে প্রসঙ্গক্রমে এবং প্রায়শই ভুল পথে। যেসব ইংরিজি লেখকদের রচনার উল্লেখ করা হল অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর লোকেদের সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক রচনা, আধুনিক রচনা, সেনসাস, গেজেটিয়ার—এগুলি ছাড়াও ইংরিজি আকরগুলির মধ্যে কোম্পানির বড়লাট বা অন্যান্য রাজকর্মচারীর ব্যক্তিগত কাগজপত্র, চিঠি, মিনিট্‌স্ ইত্যাদি এবং জীবনী; সরকারি প্রকাশনা; খ্রীষ্টান মিশনারিদের লেখা থেকেও টিপুর সমকালীন মহীশূরের চিত্র পাওয়া যায়।

সবশেষে বলা যায় যে, অধিকাংশ ইংরেজদের রচনায় টিপুর ঈস্টইনডিয়া কোম্পনি-বিরোধী সংগ্রামী চরিত্র প্রতিফলিত না হলেও, ইংরেজ লেখকদের সব কাজই মূল্যহীন নয়। যেমন, রামচন্দ্র রাও পুঙ্গনুরী লিখিত "হায়দর এবং টিপুর স্মৃতি" ইংরিজিতে অনুবাদ করে সি. পি. ব্রাউন (মাদ্রাজ, ১৮৪৯) উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। বা তারও আগে বারিশ ক্রিস্‌প টিপুর রাজস্ব বিষয়ক আইনগুলি অনুবাদ করেন। লর্ড ওয়েলেসলির নির্দেশে ফ্রান্সিস হামিলটন বুকানন—যিনি আমাদের মূল্যবান তথ্যসংগ্রহের অন্যতম পথ-প্রদর্শক—মহীশূর বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যেও ভালো লেখা আছে। একটামাত্র উদাহরণ, এল. এ রাসব্রুক উইলিয়মস্-সম্পাদিত "গ্রেট মেন অব ইনডিয়া" বইতে এইচ. এইচ. ডডওয়েল-লিখিত টিপু-বিষয়ক প্রবন্ধ। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য চার্লস স্ট্য়ার্টের "আ. ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব দ্য ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি অব দ্য লেট টিপু সুলতান" (কেমব্রিজ, ১৮০৯), স্ট্য়ার্ট হায়দর-টিপুর বিষয়ে আলোচনা করেছেন ওই বইতে, তা একপেশে ও তথ্যসমর্থিত নয়। যাই হোক, ভালো কাজগুলি বাদ দিলে কার্কপ্যাট্রিক থেকে টমসন-গ্যারাট পর্যন্ত লেখকদের রচনার সমালোচনা করে বলা যায় তিনটি সূত্র নিয়ে—(১) টিপু সুলতানকে তাঁরা ধর্মান্ধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন; (২) টিপুকে তাঁরা ইংরেজ বন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুর বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন; এবং (৩) ঔপনিবেশিক-আগ্রাসন-বিরোধী টিপুর ঐতিহাসিক ভূমিকা তাঁরা আদৌ ফুটিয়ে তোলেন নি। আমরা বর্তমান আলোচনায় এই তিনটি সূত্রই সম্প্রসারিত করে ব্রিটিশ লেখকদের অসারতা প্রমাণ করব। অবশ্য ভারতীয় লেখকদের মধ্যেও দুই ধরনের ব্যক্তি আছেন; যেমন সুরেন্দ্রনাথ সেন, বাঙালি ঐতিহাসিক, সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন তাঁর "স্টাডিজ ইন ইনডিয়ান হিস্টরি ১৯৩০" গ্রন্থে, অপরদিকে মারাঠা ঐতিহাসিক সারদেশাই টিপুর প্রতি বিদ্বেষভাব গোপন রাখতে পারেন নি। অবশ্য ওইসব লেখা আজ হাসান, আনতোনোভা, ফরেস্ট, করিম, গোপাল, গুহ প্রমুখে আধুনিক

গবেষণার পর প্রায়-বাতিল হয়ে গেছে। তবু যেহেতু অধুনা দেশে নতুন করে এক বিতর্কের ঢেউ তোলা হচ্ছে, সেজন্য ভারতের ইতিহাসে টিপু সুলতানের ভূমিকা পর্যালোচনা করা দরকার। তার আগে একটু জেনে নিই টিপুর পূর্বপুরুষদের কথা।

টিপু : নামের অর্থ, পূর্বপুরুষ, জন্ম

সাধারণ মানুষের মনে এমন একটা ধারণা আছে যে, 'টিপু' শব্দটির অর্থ বাঘ। কথাটি সঠিক নয়। কন্নড় ভাষায় বাঙলা "বাঘ" বা হিন্দি "শের" কথাটির প্রতিশব্দ হল 'হুলি'; 'সিংহ' কন্নড় ভাষাতেও সিংহ। অধ্যাপক মহিবুল হাসান বলছেন যে, আরো বহু বিশেষ অর্থহীন শব্দে যেমন নাম রাখা হয়, "টিপু" কথাটিও তাই। আমার কিন্তু মনে হয়, হায়দার আলি আর তাঁর পত্নী বেগম ফকরুন্নিসা মরমি সাধক টিপু মস্তান আউলিয়ার দরগায় প্রার্থনা জানাবার পর পুত্রসন্তান হওয়াতে তাঁরা নাম রাখেন টিপু। আবার কোনো-কোনো লেখকের ধারণা—"সুলতান" কথাটি উপাধি হিসাবে টিপু গ্রহণ করেন যখন তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন আরোহণ করেন (১৭৮২)। কিন্তু এটিও সত্যি নয়। সমসাময়িক ফারসি উপাদান-গুলি থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে সুলতান উপাধি নয়, টিপু সুলতানই পুরো নাম।

টিপু সুলতানের পিতামহ ফত্‌হ মহম্মদ ক্ষমতাবান হওয়ার আগে পর্যন্ত টিপুর পূর্বপুরুষদের বিষয়ে বিশদ জানা যায় না। ফারসি সূত্রগুলি থেকে জানা যায়, সম্ভবত ষোড়শ শতকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা আরব থেকে এসেছিলেন। কিরমানির মতে, টিপুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ শেখ ওয়ালি মহম্মদ দিল্লী থেকে দক্ষিণভারতের গুলবর্গায় এসেছিলেন। গুলবর্গা তখনকার বিজাপুর রাজ্যের (বর্তমান উত্তর কর্ণাটক) অন্তর্গত ছিল, যার সুলতান ছিলেন মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৬-৫৬)। তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, সদর-উদ-দিন হুসেইনির ধর্মস্থানে (সাধারণ নাম সিস্থ দরাজ) এসে বসবাস শুরু করেন। ওয়ালি মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আলি পিতার মৃত্যুর পর বিজাপুরে যান এবং তাঁর সাত শ্যালক সহ বসবাস শুরু করেন। এই সাত ভাই বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় আদিল শাহের কর্মচারী ছিলেন এবং পরে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে সকলেই প্রাণ হারান। এই ঘটনার পর মহম্মদ আলি, টিপুর প্রপিতামহ মহীশূরের কোলার অঞ্চলে (এখন যা স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত) বসবাস করতে থাকেন এবং চাষবাস শুরু করেন। সম্ভবত কোলারের শাসন-কর্তা শাহ্‌ মহম্মদ তাঁর পূর্বপরিচিত মহম্মদ আলিকে সাহায্য করেছিলেন। মহম্মদ আলির চার পুত্র—মহম্মদ ইলিয়াস, শেখ মহম্মদ, মহম্মদ ইমাম এবং ফত্‌হ মহম্মদ। পিতা চেয়েছিলেন চার ভাই ধর্মীয় কাজে যোগ দিক, কিন্তু তাঁরা সকলেই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়াই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। পেশাদার সৈন্য। ১৬৯৭ খ্রী মহম্মদ আলির মৃত্যুর পর ফত্‌হ মহম্মদ, টিপুর পিতামহ, কোলার ত্যাগ করে আর্কট গিয়ে সেখানকার নবাব সাদাতুল্লা খানের বাহিনীতে যোগ দেন। নবাব তাঁকে জমাদার পদ দেন, অধীনে সৈন্য পাঁচশো পদাতিক এবং পঞ্চাশটি অশ্বারোহী। তানজোরের পীরজাদা সৈয়দ বুরহানউদ্দিনের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কোনো কারণে ফত্‌হ মহম্মদ আর্কট ত্যাগ করে মহীশূর যান এবং সেই রাজ্যে রাজার বাহিনীতে যোগ দেন। সম্ভবত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হায়দর সাহেবের সাহায্যে (যিনি আগে থেকেই রাজার কর্মচারী ছিলেন)। ফত্‌হ মহম্মদ 'নায়েক' পদলাভ করলেও মহীশূরেও বেশিদিন থাকেন নি। তিনি গিয়ে যোগ দেন সিরা-র নবাব দরগাহ্‌ কুলি খানের বাহিনীতে। নবাব তাঁকে দোদবল্লপুর দুর্গের দায়িত্ব দেন—অধীনে চারশো পদাতিক এবং দুশো অশ্বারোহী। এখানে থাকতে ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র, টিপুর পিতা, হায়দর আলির জন্ম। হায়দরের অবশ্য শাহ্‌বাজ খান নামে তিন

বছরের বড়ো এক দাদা ছিলেন।

কয়েক বছর পরে দরগাহ্‌ কুলিখানের মৃত্যু হলে তৎপুত্র আবদুল রসুল খান সিরার নবাব হন। ইতোমধ্যে তাহির খান নামে জনৈক ব্যক্তি আর্কটের নবাব সাদাতুল্লা খানের সাহায্যে সিরার সুবাদারি লাভে উদ্যোগী হন। ফলে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়, যাতে আবদুল রসুল খান এবং ফত্‌হ মহম্মদ দুজনেই মারা যান। তাহির খান সিরার সুবাদার হন, যদিও আবদুল রসুল খানের পুত্র আব্বাস কুলি খান এবং হায়দর আলি আর তাঁর দাদা শাহবাজ খান বিধবা মা সহ অনেকে দোদবল্লপুর দুর্গেই থেকে যান। শেষ পর্যন্ত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ফতহ মহম্মদের বিধবা দুই নাবালক পুত্রকে নিয়ে স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্বোক্ত হায়দর সাহেবের (মহীশূরের রাজার কর্মী) সাহায্যে ব্যাঙ্গালোরে এসে কিছুদিন থাকেন এবং তারপর শ্রীরঙ্গপত্তমে এসে ওঠেন। এই জ্যাঠতুতো দাদার সাহায্যে হায়দর আলি বড়ো হন। অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। বড়ো হয়ে হায়দর আলি মহীশূর ছেড়ে কর্নাটকের নবাব মহম্মদ আলির ছোটো ভাই আবদুল ওয়াহাব খানের কাজে যোগ দেন, যিনি আবার তাকে কিট্টুরে জাগির দেন। অবশ্য দাদা হায়দর সাহেব মহীশূরে ধনী এবং ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে হায়দর আলিকে তিনি আবার ডেকে পাঠান এবং নঞ্জরাজের সামনে হাজির হন। 'নঞ্জরাজ' ছিলেন সৈন্যবাহিনীর প্রধান এবং যুদ্ধ-মন্ত্রী। (এখানে একটা কথা বলা দরকার—কারণ, পাঠ্য বইতে প্রায়ই ভুল লেখা থাকে। মহীশূরের রাজা ছিলেন হিন্দু, অকর্মণ্য, আমোদে দিন কাটাতেন। তাঁর মন্ত্রী বা 'দালওয়াই' ছিলেন দেবরাজ; নঞ্জরাজ তাঁর ভাই)। নঞ্জরাজ তরুণ হায়দর আলিকে সেনা বিভাগে পদ দেন। 'নিশান ই হায়দরি'-অনুযায়ী তিনশো পদাতিক এবং পঞ্চাশ অশ্বারোহীর নেতা। তাঁর দাদা শাহবাজ খান ছিলেন তাঁর উপরে। ক্রমে-ক্রমে নিজের যুদ্ধনৈপুণ্য, ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ সাহস, কূটকৌশল এবং অধ্যবসায়ে হায়দার আলি ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেন, তার বিস্তারিত পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ১৭৪৯ সনে নারায়ণ গৌড়ার কাছ থেকে দেবানহালি উদ্ধার থেকে যে নতুন জীবন হায়দর আলি শুরু করেন তার এক পর্ব শেষ হয় ১৮৬১ সালে।

রাজনৈতিক জীবন থেকে ব্যক্তিজীবনে আসি। সিরার পীরজাদা সয়ীদ শাহবাজ (বা শাহ মিঞা সাহেব নামে অধিক পরিচিত) ব্যক্তির কন্যা ছিলেন হায়দর আলির প্রথম স্ত্রী। তাঁর এক কন্যা, কিন্তু এই কন্যা হওয়ার সময় কঠিন অসুখে তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হন। পরে হায়দর আলি মীর মৈনুদ্দিনের (যিনি কিছু দিন কুদাপ্পার দুর্গাধিপতি ছিলেন) কন্যা ফাতিমা বা ফকরুন্নিসাকে শাদি করেন। ফকরুন্নিসা যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন হায়দর আলি আর তিনি টিপু মস্তান আউলিয়ার সমাধিক্ষেত্রে প্রার্থনা করতে যান (এই ধর্মস্থানটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন আর্কটের নবাব সাদাতুল্লা খান, ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে) এবং এক পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা পূর্ণ হয়। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন যে পুত্র, তিনিই ইতিহাসের টিপু সুলতান।

টিপু সুলতান : শাহজাদা থেকে নবাবজাদা

নিজে লেখাপড়া না শিখতে পারলেও পুত্র টিপুকে হিন্দু পণ্ডিত এবং মুসলমান মৌলবী উভয়ের কাছেই শিক্ষালাভ করিয়েছিলেন পিতা হায়দার আলি। এতে হায়দরের মানসিকতা যেমন বোঝা যায়, তেমনি টিপুর মানস-প্রকৃতির গঠনও বোঝা সম্ভব হয়। উভয়েই জানতেন ভারতের প্রকৃতি বুঝতে গেলে উভয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। প্রয়োজন হিন্দু-মুসলমানের আনুগত্য। সেই সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাও শেখেন টিপু। শুধু প্রাচ্যবিদ্যা বা প্রাচ্যের ইতিহাস, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক নিজস্ব পুস্তকসংগ্রহ থেকেই

টিপুর পড়ার ব্যাপ্তি বোঝা যায়। **সমসাময়িক দেশীয় রাজা-মহারাজাদের মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম টিপু সুলতান**, যিনি ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ঘটনাবলীর খোঁজ রাখতেন। ফরাসি বিপ্লব তাঁকে প্রভাবিত করে। টিপুর মৃত্যুর দশ-বারো বছরের মধ্যেই অবশ্য প্রথম আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন আধুনিক-মনস্ক ভারতীয় মনীষী রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এক হিসেবে টিপু রামমোহনেরও পূর্বসূরী। অধ্যাপক মহিবুল হাসান জানিয়েছেন যে, টিপুই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজের পুত্রদের ইয়োরোপে লেখাপড়া শেখাবার কথা পর্যন্ত চিন্তা করেছিলেন।

যাই হোক, যতদিন হায়দর আলি মহীশূরে ক্ষমতাসীন ছিলেন ততদিন শাহজাদা টিপু কিভাবে নিজেকে তৈরি করেন; বত্রিশ বছর বয়সে সিংহাসন লাভের সময় তাঁর মানস-প্রকৃতি, দোষ-গুণ ইত্যাদি গড়ে ওঠার কাহিনী চিন্তাকর্ষক হলেও, এখানে তার সবিস্তার আলোচনার স্থানাভাব। টিপু সুলতান ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন মহীশূর রাজ্যের সিংহাসন লাভ করলেন তখন রাজ্যের এক সঙ্কটকাল। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে তাঁদের রাজ্যের যুদ্ধ চলছে, যে যুদ্ধে তাঁর পিতা হায়দর আলি খানের মৃত্যু হয় (৭ ডিসেমবর, ১৭৮২)। ইতিহাসে তা দ্বিতীয় **ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** নামে পরিচিত। হায়দর ক্ষমতায় এসেছিলেন শুধু মহীশূরের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নয়, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিও সঙ্কটকাল। খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬১। পানিপথের প্রান্তরের তৃতীয় যুদ্ধে সে বছরই মারাঠাদের দর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন আফগান আক্রমণকারী আহমদ শাহ আবদালী। মারাঠাদের পতন, বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যু এবং পুনা দরবারের ক্ষমতা হ্রাসের সুযোগ নিয়ে নবগঠিত মহীশূর রাজ্যকে বর্ধিত করতে মনস্থ করলেন হায়দর। ঐতিহাসিকের রায় এই যে,

'he was simultaneously confronted with the hostilities of the Nizam of Hydrabad, the Marathas and the English, but he was never overwhelmed by the heavy odds against him.' অর্থাৎ একই সঙ্গে হায়দ্রাবাদের নিজাম, মারাঠা আর ইংরেজ ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির বৈরিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু এই প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও কখনো তিনি ঘাবড়ান নি। ১৭৩৬ খ্রী থেকে এই ত্রয়ী শক্তি একসঙ্গে হায়দর আলির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ। তৎসত্ত্বেও ১৭৬৮-৬৯ সনের প্রথম **ইঙ্গ-মহীশূর** যুদ্ধে হায়দর আলি ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং সন্ধি করতে বাধ্য করেন। দু বছর পরেই ইংরেজরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন, যেমন ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের আগে কথার খেলাপ করে নিজাম আর পেশওয়া। ১৭৮১ খ্রী ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকুটের কাছে পরাজিত হলেও হায়দর আলি যুদ্ধ চালিয়ে যান। দুর্ভাগ্যবশত, দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলতে-চলতেই ক্যানসার এবং কার্বাঙ্কল থেকে ক্ষত বিষিয়ে তাঁর মৃত্যু হয় এবং আপৎকালীন অবস্থায় ক্ষমতা পেয়েই টিপু সুলতান যুদ্ধ চালাতে থাকেন।

টিপু সিংহাসনে বসবার আগেই হায়দর আলি পরাজিত করেছিলেন কর্নেল ব্রেথওয়েটকে। পিতার মতোই সাহসী, যুদ্ধনিপুণ টিপু সুলতানও ব্রিগেডিয়ার ম্যাথুস-পরিচালিত সৈন্যদের পরাজিত করেন। ব্রিগেডিয়ারকে বন্দী করে ইংরেজদের ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি (মার্চ, ১৭৮৪) করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি অবশ্য ক্ষণস্থায়ী, কারণ পাঁচ বছর পরেই শুরু হয় তৃতীয় **ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ**। এই যুদ্ধেও তিনি অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যথারীতি নিজাম ও মারাঠারা ছিলেন। তখন বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস নিজেও যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি (১৭৯২) করতে বাধ্য হন। প্রভূত ক্ষতিস্বীকার করতে হল—প্রায় অর্ধেক রাজত্ব হাতছাড়া, তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ইংরেজরা তাঁর দুই

পুত্রকে ধরে নিয়ে গেল। তবু টিপু সুলতান দমলেন না, বা ইংরেজ শোষণকারীদের কাছে মাথা নত করলেন না। তুলে ধরলেন তাঁর বিখ্যাত তরবারি।

টিপু সুলতান সুযোগ খুঁজতে লাগলেন প্রতিশোধের। ইংরেজ কোম্পানির শত্রু ফরাসিদের সাহায্য নিয়ে নব সাজে গড়ে তুললেন নিজের সৈন্যবাহিনী। দূত পাঠালেন সুদূর আরব, কাবুল, কনস্ট্যানটিনোপল, ফ্রান্স এবং ফরাসি-অধিকৃত মরিশাসে। ফ্রান্সে তত-দিনে বিপ্লব ঘটে গেছে। "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"র শ্লোগানে মুখর ফ্রান্স। টিপু সদস্য হলেন পারীর জ্যাকোবিন ক্লাবের। এসব কথা বিস্তারিত বলার ক্ষেত্র অবশ্য এই আলোচনা নয়। এরপর ভারতে এলেন ইংরেজ কোম্পানির প্রধান হয়ে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী রিচার্ড কোলি ওয়েলেসলি (১৭৯৮)। এই আর্ল অব মর্নিংটন (১৭৬০-১৮৪২) ও তার ছোট ভাই আর্থার ওয়েলেসলি (১৭৬৯ ১৮৫২); পরবর্তী কালে বিখ্যাত ডিউক অব ওয়েলিংটন) দুজনেই ভারতে ছিলেন ১৮০৫ পর্যন্ত। বড়লাট ওয়েলেসলির কানে গেল টিপুর প্রস্তুতির কথা। তিনি টিপুকে তথাকথিত "অধীনতা-মূলক মিত্রতা"র প্রস্তাব দিলেন, টিপু তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ ভারতীয় দেশীয় রাজ্য-গুলির মধ্যে নিজাম, মারাঠা, আউধ প্রমুখ অনেকেই তা সহজে মেনে নিয়ে ইংরেজদের গোলামে পরিণত হল। মারাঠা এবং নিজামের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করলেন ওয়েলেসলি এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন টিপুর রাজ্যের উপরে (মার্চ, ১৭৯৯)। চারিদিকে বিশাল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা তাঁর সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হল না, প্রত্যাশামতো বিদেশী সাহায্যও এসে পৌঁছয় নি। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন টিপু (মে, ১৭৯৯)। প্রাণ দিলেন, তবু মান দিলেন না। ভারত ইতিহাস অভিধানে তাই যথার্থই লিখিত হয়েছে :

'He was a diplomat with a large vision, and if his efforts to build up an anti-English front in India failed, it was not his fault. Above all he was the only Indian ruler who never allied himself with the English against any Indian ruler, Hindu or Muhameden, though he had every reason for deeply resenting their conduct towards him.' (সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৭৮)।

ইংরেজদের প্রতিরোধ তাঁর মতো কেউ করতে চান নি বা করেন নি। ফলে ইংরেজ লেখকরা টিপু সুলতানকে বিকৃত করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী! মার্ক উইলকস্ ১৭৯৮তে কঠিন অবস্থাতেও টিপুর যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রশংসা করেছেন (হিস্টোরিক্যাল স্কেচেস", ২য় খণ্ড, পৃ ৬১০)। এমনকী কার্কপ্যাট্রিকের মতো টিপুবিদ্বেষীও মহীশূর বাহিনীর প্রশংসা করতে বাধ্য হন ("সিলেক্ট লেটারস", পূর্বোল্লিখিত, পরিশিষ্ট এল)। ভারতীয় রাজ্যগুলির সাহায্য না পাওয়া, ফ্রান্সের প্রত্যাশিত সাহায্য না পাওয়া, ভাববাদী চিন্তা, শাসকশ্রেণীর একাংশের বিরোধিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা (ড. মহিবুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৪-২৯) প্রভৃতি কারণে টিপুর পরাজয় হলেও তা গৌরবের। সুতরাং টিপুর ঔপনিবেশিক-ইংরেজ-বিরোধী ভূমিকা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল। বাকি রইল দুটি প্রশ্ন।

বন্দীদের প্রতি টিপু কি নিষ্ঠুর?
টিপু সুলতান কি সাম্প্রদায়িক?

প্রশ্ন দুটি করতে হল। কারণ ইংরেজরা এই ধুয়ো তুলে দিয়েছিল। আশ্চর্য, আজ হিন্দু সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা একই কথা বলছেন, বিশেষ করে টিপুকে "ধর্মান্ধ" প্রতিপন্ন করার অনৈতিহাসিক কথা প্রচার করছেন। অনৈতিহাসিক—কারণ কথাটি ইতিহাসের তথ্য আর যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয়। মহীশূর রাজ্যে হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক হায়দর আলি গড়ে তুলে-ছিলেন যেভাবে, টিপু তা ভাঙার মতন বোকা ছিলেন

না। আধুনিক গবেষকও সেকথা বলছেন (দ্র. নিখিলেশ গুহ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৭-৯৮)।

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য পূর্বোল্লিখিত "ডিকশনারি অব ইনডিয়ান হিস্টরি"তে টিপু সুলতান সম্পর্কে লিখেছেন :

"Hostility to him had so deeply darkened the vision of some contemporary English historians that they described him as a religious fanatic and tyrannical ruler. But these charges are all unfounded. He was a very diligent and capable ruler and administrator who made Mysore a prosperous state in spite of the wars that he had to fight. *He was no fanatic and generally treated his Hindu subjects with fair tolerance.*"

(উদ্ধৃতিতে বাঁকা হরফ আমি যোগ করলাম)। কারণ লেখক যে লিখেছেন যে টিপু আদৌ ধর্মান্ধ ছিলেন না, তাতে তিনি শতকরা একশোভাগ সত্যি কথা লিখেছেন। বর্তমানে সে বিষয়ে একটু বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণসহ আলোচনা করি।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ফারসি ভাষার অধ্যাপক উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক টিপুকে বর্ণনা করেছেন 'অসহিষ্ণু, গোঁড়া ধর্মান্ধ'রূপে ('the intolerant bigot or the furious fanatic', *op cit*, p X)। একদা সৈন্যবাহিনীর মেজর ও হার্টফোর্ডে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির কলেজে প্রাচ্য-ভাষার অধ্যাপক চার্লস স্টুয়ার্ট লিখেছেন যে টিপু ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন জারি করে মেলকোট শ্রীরঙ্গপত্তম ছাড়া তাঁর রাজ্যের সব হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (*A Descriptive Catalogue*, পূর্বোল্লিখিত, লনডন, ১৮০৯, পৃ ৪২, ৫৩)। মার্ক উইলকস্ আরো এক ধাপ এগিয়ে। তিনি লিখেছেন টিপু বলপূর্বক ধর্মান্তর, গণধর্মান্তর, মন্দিরধ্বংস, মন্দিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সবই করতেন এবং তাঁরও সিদ্ধান্ত টিপু 'অসহিষ্ণু ধর্মান্ধ' ('an intolerant bigot', *History of Mysore*, vol. II, p 766)। এমন মত আরো আছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে পি. ই. রবার্টস্, টমসন ও গ্যারাট, এমনকী ভারতীয় ইতিহাসবিদ সারদেশাই পর্যন্ত অনুরূপ মত মেনে নিয়েছেন। এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন বাঙালি ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর মতে, টিপু ধর্মান্ধ ছিলেন না এবং যখন তিনি ধর্মান্তর করিয়েছেন তখনও তার উদ্দেশ্য ধর্মীয় নয়, মূলত রাজনৈতিক (*Studies in Indian History*, Cal, 1930, pp 166-67)। ইংরেজ ঐতিহাসিক-মধ্যেও ডডওয়েল বরং টিপুর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় :

'In fact, a rational consideration of his career shows him not the bigoted tyrant of tradition, but an active, enterprising man, moving in a world in which new forces had recently been let loose, forces beyond his control and to some extent beyond his comprehension.'

(দ্র রাসব্রুক উইলিয়ম সম্পাদিত, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২১৭)।

বস্তুত, টিপু সুলতানের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার কালিমা যাঁরা লেপন করতে চেয়েছেন এবং চাইছেন তাঁরাই সাম্প্রদায়িক। ইতিহাসের তথ্য—নানা আকর-উপাদান থেকে গৃহীত প্রমাণ একথাই নির্দেশ করে যে টিপু ধর্মান্ধ ছিলেন না, বরং শাসক হিসেবে জ্ঞানদীপ্ত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুগণ উচ্চ রাজপদ লাভ করেছিলেন; হিন্দুদের নিজস্ব মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণ ও পূজার্চনার পূর্ণ অধিকার ছিল; টিপু হিন্দুদের মন্দিরে ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণীকে ভূমিদান করেছেন; অপৌত্তলিক হয়েও হিন্দুদের ঈশ্বরের মূর্তি বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনেক ক্ষেত্রে অর্থ দিয়েছেন; এমনকী, একবার এক মন্দির

নির্মাণের নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছেন। প্রতিটিরই প্রমাণ আছে। আমরা একটু পরেই সে প্রসঙ্গে আসব। একটা কথা আগে বলা দরকার।

কিছু লেখক বলার চেষ্টা করেছেন যে, টিপু শুধু হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, খ্রীষ্টানবিদ্বেষীও ছিলেন। এই বিদ্বেষবশতই তিনি খ্রীষ্টান যুদ্ধবন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। এই অভিযোগও ভিত্তিহীন। অকারণে টিপু কারো প্রতি নিষ্ঠুর ছিলেন না। বরং খ্রীষ্টান ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের একাংশই ধর্মীয় কাজ ছাড়াও, কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধিতে ঔপনিবেশিক রাজনীতিবিদ ও সৈন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। অ-মুসলমানদের প্রতি টিপুর আচরণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখতে হবে। মহিবুল হাসানের মত যুক্তিগ্রাহ্য :

'There is no doubt that he sometimes ill-treated his non-Muslim subjects, but this was not due to their religion; it was because they were guilty of disloyalty. He, like his father Haidar Ali kept religion and politics apart and rarely permitted his personal beliefs to influence his administrative policies. He treated his Muslim subjects with equal harshness when they were guilty of disloyalty or treason'. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৫৭)। সুলতান হিসেবে টিপু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বন্দীদের দেখতেন। বরং অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দী ইংরেজদের প্রতি আরো কঠোর হওয়াই উচিত ছিল। অধ্যাপক হাসান "টিপু অ্যানড দ্য ইংলিশ প্রিজনারস্ অব ওয়র" শীর্ষক দ্বিতীয় পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত অংশে তাঁর বইয়ে বিষয়টির সুন্দর আলোচনা করেছেন।

এবার শেষ প্রশ্ন। এইটি যত গণ্ডগোলের হেতুহীন হেতু। টিপুর ব্যক্তিগত শাসন সাম্প্রদায়িক কিনা, বা ইংরেজ লেখকদের 'দ্য ইনটলারান্যানট ফ্যানাটিক' কুৎসা সত্যি কিনা বিচার করি। এ বিষয়েও সুরেন্দ্রনাথ সেন, মহিবুল হাসান থেকে সুব্বারায়া চেট্টি, সি. কে. করিম, নিখিলেশ গুহ প্রমুখের আধুনিক গবেষণা ইতোমধ্যেই ইংরেজদের কুৎসার সমুচিত জবাব দিয়েছে। তবু আজ নতুন করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে ইতিহাসকে অস্বীকার করে। হায়দর আলি এবং টিপু সুলতানের কাছে রাজনীতি এবং ধর্ম ছিল ভিন্ন ব্যাপার; অথচ আজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ধর্মকে এবং সেই সঙ্গে ইতিহাস-বিকৃতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে প্রশাসনের শীর্ষে নিজে থেকে শাসকশ্রেণীর নানা ব্যক্তির সাহায্যে নানা বিভাগীয় কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখতেন হায়দর এবং টিপু; প্রতিনিয়ত খোঁজ রাখতেন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার, কখনো চরের সাহায্যে (কিরমানি, পৃ ৪৭৩-৭৫; বিটসন, পৃ ১৫৬-৬১; হাসান, পৃ ৩৭০-৭১, উইলকস্, ২য় খণ্ড, পৃ ৫৯২-৯৩)। টিপু যে নতুন ক্যালেনডার চালু করেন সচরাচর মুসলিম শাসকদের কাছে গৃহীত হিজরা বা হিজরি সনের পরিবর্তে, তা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে গ্রহণীয় ছিল। হায়দর 'রাজাধিরাজ-রাজ-পরমেশ্বরম' ধরনের হিন্দু উপাধিও ধারণ করতেন, টিপু তেমন করেন নি; বরং তাঁর সরকার 'ফুদাদাদ সরকার', 'আহমদি সরকার', 'আসাদ-ইলাহি সরকার' ইত্যাদি নামে অভিহিত হলেও বা তাঁর প্রাসাদের দরোজায় আরবি ভাষায় তাঁকে 'ধর্মের রক্ষক' ঘোষণা করা হলেও বা আঞ্চলিক শাসনে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য কমিয়ে দেওয়া হলেও, সাধারণভাবে হিন্দু মন্দির-গুলির প্রতি টিপু ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। হিন্দু প্রজাদেরও তিনি অকারণে নিপীড়ন করেন নি। বস্তুত টিপু সুলতান পিতার পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন।

মহীশূরের জাঁকজমকপূর্ণ হিন্দু দশেরা উৎসবে হায়দর আলি রাজা কৃষ্ণরাজ উদেয়ার, নঞ্জরাজ ও তাঁর পুত্রগণ, দেবরাজ প্রমুখের সঙ্গে সোৎসাহে যোগ দিতেন। তিনি উচ্চ পদে হিন্দুদের নিয়োগও করে-ছিলেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে টিপু পিতার পথ থেকে

বিচ্যুত হন বলে মনে হয় না, গোঁড়া মুসলমান কিরমানি বা বিদ্বেষী স্ট্যুর্ট বা কার্কপ্যাট্রিক যাই বলুন। টিপু যে হিন্দুদের উঁচু পদ দিতেন, তার প্রমাণ তো ইংরেজদের লেখাতেও আছে। পূর্ণাইয়া পণ্ডিত ছিলেন 'মীর আসফ'-এর মতো উঁচু পদে। কৃষ্ণ রাও কোষাধ্যক্ষ, সামাইয়া আয়েঙ্গার পুলিশ মন্ত্রী, তাঁর ভাই রঙ্গা আয়েঙ্গার ও নরসিমহা রাও শ্রীরঙ্গপত্তনম উঁচু পদে আসীন ছিলেন। শ্রীনিবাস রাও ও আপ্পানি রাম ছিলেন টিপুর খুব ঘনিষ্ঠ। একসময় পর্যন্ত খণ্ডে রাও-ও তাই। কূটনৈতিক ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান পেশকার সুবা রাও। কার্ক প্যাট্রিক জানিয়েছেন যে মুঘল দরবারে টিপুর দূত দুই হিন্দু মুলচাঁদ ও সুজন রাই। সঙ্গে মুকুন্দ রাও। পুন্নুরী জানিয়েছেন যে, সুলতান নায়েক রাও ও নায়েক সঙ্গনকে খুবই বিশ্বাস করতেন। এমনকী মার্ক উইলকস এক ভিন্ন প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে (ইনি অন্যত্র হিন্দু নিপীড়নের কথা বলেছেন) টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনের সরকারি বাসস্থান-গুলির একাংশ শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা রেখে-ছিলেন (পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৫৯২)। টিপুর মুনসীদের অন্যতম প্রধান ছিলেন নরসাইয়া। নাগাপ্পা নামক এক ব্রাহ্মণকে কুর্গের ফৌজদার করা হয়। অনেক ব্রাহ্মণকে মালাবারের বনে কাঠ-কাটার একক অধিকার দেওয়া হয়। অপর এক ব্রাহ্মণকে কোয়েম্বাটোরের এবং পরে পালঘাটের 'আসফ' পদ দেওয়া হয়। টিপুর বহু 'আমিল' বা রাজস্ব অফিসার ছিলেন হিন্দু। সৈন্যবাহিনীতেও বহু উঁচু পদ হিন্দুদের দেওয়া হয়েছিল। যেমন হরি সিং, শ্রীপত রাও, শিবাজী, রামা রাও প্রমুখ। এই হিন্দুদের মধ্যে কানাড়ি, মারাঠি, তেলুগু, মালয়ালি সবাই ছিলেন (দ্র, কার্কপ্যাট্রিক, পৃ ৭৩; পুন্নানুরী, পৃ ৪২, ৮৭; তারিখ ই কুর্গ, ২৭, কিরমানি, পৃ ২৭৯; হাসান, ৩৫৯-৬০; রাইস্, ১ম খণ্ড, পৃ ২৯৯; গুহ, পৃ ৯৮; ইত্যাদি। সুতরাং মহীশূর রাজ্য যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ উদ্যোগে শাসিত হত হায়দর আলি এবং টিপু সুলতানের আমলে, তাতে সন্দেহ নেই।

এবার টিপু সুলতানের বিখ্যাত শৃঙ্গেরী মঠের পত্রাবলী প্রসঙ্গে আসি—যেগুলি তাঁর ধর্মনীতির, বিশেষত হিন্দু-মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধার উজ্জ্বল নিদর্শন। চিঠিগুলি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ওই মঠে আবিষ্কার করেন মহীশূরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা রায় বাহাদুর কে. নরসিমহাচারি এবং তা ওই বছরই 'মাইশোর আর্কিওলজিকাল জার্নালে' উল্লিখিত হয় (পৃ ১০-১১, ৭৩-৭৬)। মোট ২৫টি চিঠি পাওয়া যায়, যেগুলি সীলমোহরসহ সরকারি পত্রে শিখেছিলেন স্বয়ং টিপু সুলতান শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষকে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের কাছে শৃঙ্গেরী মঠ, দুগ্ধভাণ্ডার বামপারে ওই নামের গ্রামের মঠ খুবই শ্রদ্ধার স্থান; অষ্টম শতকে আদি শঙ্করাচার্যের ভারতের চারটি মূল মঠের এটি অন্যতম। ওই মঠের অধ্যক্ষও বরাবর হিন্দুদের কাছে শঙ্করাচার্য-রূপেই শ্রদ্ধেয়। তাঁর সঙ্গে টিপুর ছিল সুসম্পর্ক। তাঁকে টিপু এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আপনি জগদ্‌গুরু, আপনি তো চিরকালই সারা জগতের জন্য তপস্যা করে এসেছেন যাতে জগৎ সমৃদ্ধ হয় এবং জনগণ সুখে থাকে। অনুগ্রহ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে আমার রাজ্যের সমৃদ্ধি হয়। যে রাজ্যে আপনার মতন মানুষ বসবাস করেন, সে রাজ্য বর্ষায় শস্য-শ্যামলা হবেই।' চিঠির তারিখ ১৭৯৩। এইরূপ আরেক চিঠিতে দেখা যায় যে, তিনি মঠে 'শত-চণ্ডী জপ' এবং 'সহস্র-চণ্ডী জপ' করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন, এবং তার জন্য সমস্ত খরচ নির্বাহ করতে যে রাজি, তা জানাচ্ছেন। কেন? রাজ্যের শাসকের (টিপু) এবং রাজ্যের (মহীশূরের) মঙ্গলের জন্য এবং শত্রুদের (ইংরেজদের) বিনাশের জন্য। আরেক চিঠিতে জানাচ্ছেন, ওই মর্মে তিনি তাঁর লোকেদের নির্দেশই দিয়েছেন। ১৭৯২ সালে এক চিঠিতে দেখা যায় তিনি শঙ্করাচার্যকে একজোড়া রুপোর বালা পাঠাচ্ছেন। বেদনুরের আসফকে হুকুম দিচ্ছেন মঠের অধ্যক্ষকে

একটি পালকি পাঠানোর জন্য। সাহায্য বা অর্থ পাঠানোর কথা জানা যায় বহু চিঠিতে। প্রসঙ্গত জানাই, শৃঙ্গেরী মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা; তাঁর প্রতিও ছিল টিপুর শ্রদ্ধা। টিপু সুলতান যদি ধর্মান্ধ হতেন তা হলে কি তিনি শঙ্করাচার্যকে 'জগদ্‌গুরু' বলতেন, না নিয়মিত অর্থ পাঠাতেন? চিঠিগুলির ভাষাও খুবই বিনত, পরম শ্রদ্ধাবনত চিত্তে লেখা। শুধু কি তাই! এই শৃঙ্গেরী মঠেরই একবার ক্ষতি হল। কাদের হাতে? না, ঘোড়সওয়ার মারাঠি আক্রমণকারী রঘুনাথ রাও পট্টবর্ধন নামে এক হিন্দুর হাতে। বহু লোককে হত্যা ও ব্রাহ্মণদের আহত করে দস্যু মঠের ধনরত্ন লুণ্ঠন করলেন, পবিত্র দেবীমূর্তির ক্ষতিসাধন পর্যন্ত হল। অধ্যক্ষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন এবং কারাকাল থেকে তিনি সাহায্য চাইলেন। কার কাছে? কোনো হিন্দু নয়, মুসলমান টিপুর কাছে। মূর্তি প্রতিষ্ঠা সহ সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি দূর করতে সক্রিয় সাহায্য করলেন টিপু সুলতান যিনি এক চিঠিতে লিখেছেন: 'যারা এমন অন্যায় পাপকর্ম করেছে এই পবিত্র ধর্মস্থানে তারা অচিরেই তাদের অপকর্মের সমুচিত জবাব পাবে।' সব ক্ষতি পূরণ হওয়ার পর টিপু প্রসাদ খেয়ে তৃপ্তি অনুভব করেন। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সুরেন্দ্রনাথ সেন, "দ্য শৃঙ্গেরী লেটারস অব টিপু সুলতান", স্টাডিজ ইন ইনডিয়ান হিস্টরি, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৫-১৬৯। অপিচ, হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৮-৬০।

টিপুর এই পৃষ্ঠপোষকতা ও শ্রদ্ধা শুধু শৃঙ্গেরী মঠেই সীমাবদ্ধ ছিল ভাবলে ভুল হবে। নঞ্জনগোড়-এর লক্ষ্মীকান্ত মন্দিরে রক্ষিত চারটি রুপার কাপ, রুপার থালা এবং রুপার হাতার গায়ে খোদিত লিপি থেকে জানা যায় সেগুলি টিপুর উপহার। (মাইশোর আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট, ১৯১৭, পৃ ৫৯)। তেমনি মেলকোটে নারায়ণস্বামীমন্দিরে টিপুর উপহৃত সোনা-রুপার বাসনপত্র পাওয়া গেছে। (তদেব, পৃ ২১, ৩৭)। টিপু সুলতান ঐ মন্দিরে আগে বারোটি হাতিও উপহার দিয়েছিলেন। নাগরের ভেঙ্কটরামানা মন্দিরে টিপু একটি ঘণ্টা উপহার দেন, যা তিনি একটি ডাচ চার্চ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। একবার পরাকাল মন্দিরে দুইদল পূজারীর মধ্যেকার বিবাদ তিনি মিটিয়ে দেন। তথ্য আছে যে, তাঁর রাজত্বকালের গোড়া থেকেই তিনি বরামহলের দেবত্র ভূসম্পত্তিকে সরকারি দখলের আওতার বাইরে রেখেছিলেন। কাবেরীপট্টি গ্রামের চন্দ্রমৌলিশ্বর মন্দিরের জমি দখল হয়ে গেলে তিনি বরামহলে আমিলদারকে তা ফেরত দেবার নির্দেশ দেন (গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৭)। নঞ্জনগোড়-এর শ্রীকান্তেশ্বর মন্দিরের দামি রত্নসমন্বিত কাপ টিপুর দান। ওই এলাকার নঞ্জুনদেবেশ্বর মন্দিরে সবুজ রঙের যে শিবলিঙ্গটি 'পাদশা লিঙ্গ' নামে পরিচিত, তা টিপুর নির্দেশেই স্থাপিত (মাইশোর আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট, ১৯১২, পৃ ২৩, ৪০, ৫৯)। সুব্বারায়া চেট্টি এবং ড. করিম—এই দুই আধুনিক ঐতিহাসিক আরো তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। প্রথম গবেষক স্থানীয় মালমশলার সাহায্যে দেখান যে রত্নগিরির ভেঙ্কট-রামানা মন্দির ও তিরুমাল মন্দির, পুষ্পগিরি মঠ, গাঙ্কীকোটাতে অক্কুনস্বামী মন্দির, গাতুপেট-এর নরসিংহস্বামী মন্দির, মাতুর-এর প্রসন্ন ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির, পেরাবলিতে শ্রীরঙ্গ মন্দির ইত্যাদি টিপুর সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল। দ্বিতীয় গবেষক মালয়ালাম সূত্র থেকে দেখিয়েছেন যে দক্ষিণ মালাবার অঞ্চলে বহু মন্দিরকেই তিনি নিষ্কর জমি দান করেন। এসব কি ধর্মান্ধতার নমুনা?

শ্রীরঙ্গপত্তনমে টিপুর প্রাসাদের কাছে রঙ্গনাথ মন্দির দিয়ে শেষ করি। এই মন্দিরের প্রতি টিপু সুলতানের ছিল অন্তরের টান। বহু দান তিনি এখানে করেছেন। মনে পড়ে, যখন ব্যাঙ্গালোর থেকে মহীশূরে টিপুর রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছি, এক হিন্দু গাইড ও ইতিহাসানুরাগী টিপুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে-করতে বললেন, 'জানেন তো প্রোফেসর

সাব, টিপু তো শের কা বাচ্চা শের, তাকে কেউ সামনে থেকে মারতে পারত না। সাহেব কুত্তারা তাই পেছন থেকে মেরেছিল।' কথাটায় অতিরঞ্জন থাকলেও, আজও তা মহীশূরের সাধারণ মানুষদের অন্তরের বিশ্বাস। যেমন ধারণা—টিপুর মৃত্যু হয় সাধারণ মানুষদের মধ্যে মিশে গিয়ে যুদ্ধ করতে-করতে। তাই তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি। দুর্গের মধ্যে অবশ্য ইংরিজি ফলক আছে যেখানে টিপুর দেহ পাওয়া যায়। এক কর্ণাটকী ভদ্রলোক দুর্গের মধ্যেকার মন্দির দেখিয়ে বললেন, 'টিপু এই মন্দিরে পুজো না দিয়ে কোথাও যেতেন না।' রঙ্গনাথ মন্দিরে অদ্যাপি গেলে দেখতে পাবেন এখনো পুজো হচ্ছে প্রতিদিন। টিপু সুলতান নেই, কিন্তু তাঁর রাজ্যের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির নিদর্শন আছে। চতুর ঔপনিবেশিকরা নিজ স্বার্থে টিপুর গায়ে কালি ছিটিয়েছিল, তবে আমরা আধুনিক যুগের ইতিহাসমনস্ক মানুষ শিক্ষিত হয়ে সেই তথ্যভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাস করব কেন? কোনো গোঁড়া সাম্প্রদায়িক দল চিৎকার করলেই কি ইতিহাস পালটে যায়? হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে টিপু সুলতান সকল ভারতীয় মানুষের প্রিয়। ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা বীর সৈনিকের, ইংরেজবিরোধী দেশীয় নায়কের, এক অসাম্প্রদায়িক প্রশাসকের।

মদনাদীঘির বৃত্তান্ত

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ বালীকোতরং গ্রামের প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার পীতাম্বর গুহর ত্রয়োদশ-পুরুষ-বংশধর এখন শয্যাশায়ী। সম্ভবত সামনের শীতেই সে দেহ রাখবে। তাই উৎসবানন্দে কিছুটা ভাটা পড়লেও ঠাট-জমক-আয়োজন-আলোর রোশনাই-বাজি পোড়ানো—সব ঠিকই আছে।

বক্সে গান, তাসখেলা, ভিডিও খোলা, গোপনে দামি মদ্যপান—সাঁওতাল ভূমিজ বাগদিদের ল্যাংটো শিশুগুলির নাচা-কোঁদা—অতিথি-অভ্যাগতদের প্রসাদভক্ষণ—পান সিগারেট বণ্টন—প্যানডেলে লাগানো ঝাড়ের শ-শ চোখের উজ্জ্বলতা—সবকিছুর ভেতর দিয়ে এক দেমাকি প্রসন্নতা ঝরে পড়তে চাইছিল। গুহ-রায়চৌধুরীদের আভিজাত্য একটা ঠাণ্ডা বাস্তুসাপের মতো চাপা শব্দে এলোমেলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ সবকিছুর তদ্বির-তদারকিতে কই হ্যায়? গগন কড়া—

—এই যে মামা, বলে দেন কী কাজ—এখানেই আছি।

গগন উপস্থিত। গুহদের পরামর্শদাতা গগন—টাওটার গগন—সমদরদি গগন—অসহায় গগন—দালাল গগন—শালা গগন কড়া হাজির।

মাস্টার জামাই হারাধন জানা তাস হাতে নিয়ে একগাদা থুথু ফেলে ওঁক-ওঁক ঢেকুর তোলে। সুপুরি জর্দা লেগেছে বুকে। গগনের উদ্দেশে বলে, গগনদা, এক গ্যালাস জল দে—আর হারামির পোদের তাড়া-তাড়া—কানের কাছে চিল্লামিল্লি—দু হাজার শর্ট চলছে। ওহে মাইকবালা, তমার হাবা-হাবা একটু আস্তে কর—

এ সময় কৃষ্ণপক্ষের ঘন কালিতে ডুব দিয়ে মদনা-দীঘির পাড়ে চুপি-চুপি বসেছিল দুজন। অন্ধকারের সঙ্গে পান করে চলেছিল বংশগৌরবের উত্তেজনা। পীতাম্বর যদি হয় প্রথম এবং শয্যাশায়ী তুলসীচরণ যদি হয় ত্রয়োদশ, তবে পঞ্চদশ সুপর্ণকুমার মেদিনী-পুর শহরের নামজাদা নার্সিংহোমআলা হরিপদ

মাইতির ডাক্তারপুত্র বন্ধু কাঞ্চনের সঙ্গে ভাগ করে হাফ পাঁইট ভি. এস. গলায় ঢেলে নিঃশ্বাস ছাড়ল। চতুর্দশ সনাতনের পুত্র সুপর্ণকুমার নিজেও ডাক্তার। নর্থ বেঙ্গলের এক জেলাসদর হাসপাতালের চাইল্ড স্পেশালিস্ট। বাড়ির সাড়ম্বর কালীপূজা উপলক্ষে সস্ত্রীক দেশে এসেছে। সাতের দশকে একসঙ্গে রাজনীতিকরা ব্যাচ-মেড প্রাণের বন্ধু, নিজের জেলা সদরের এক নম্বর রাখোয়ালা মাইতিনন্দন কাঞ্চনকে আসবার সময় তুলে নিয়েছে সঙ্গে।

কচি ব্যাঙ আর ঝিঁ-ঝিঁর শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধুর পারিবারিক হিস্ট্রি শুনছিল কাঞ্চন। সে নিজে সাধারণ চাষির সন্তান। জমি বিক্রি করে ডাক্তারি পড়িয়েছিল বাবা। পরে বিকল্পচাষ, সার-ওষুধের দোকান ও আরো পরে বাস-লরির দৌলতে আজ চার বছরে বাপ হরিপদ জেলাশহরে চারতলা বাড়ি হাঁকিয়ে তাকে নার্সিং হোম করে দিয়েছে। এখন মানুষ হাসপাতালে না গিয়ে নার্সিং হোমেই ঢোকে। তার বংশের অতীত রঙহীন—বড়ো ফ্যাকাশে! কিন্তু বর্ণ ও গন্ধের প্রতি যে মোহ আর আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন, তার স্বাদগ্রহণ থেকে সে বিরত থাকতে পারে না। মন দিয়ে শোনে বন্ধু সুপর্ণর কথা। চোখ দেখে মজা পায় গগন কড়ার কাণ্ডকারবার। যেন একটা জীবন্ত রহস্য! তল খুঁজে পাওয়া ভার! মদনাদীঘির জলের গভীরতা কত অনুমান করা সহজ; গগন কড়ার মগজ কখন যে কোথায় কিভাবে কাজ করে ভাবা কঠিন। সমস্ত হিসেবকে বানচাল করে দিতে ওস্তাদ লোক এই গগন কড়া! সামনে সবাই সমঝে চলে এই প্রাচীন প্রাণটিকে।

অন্ধকার—হুইস্কির গন্ধ—সিগরেটের ধোঁয়া—মশাদের বজ্জাতি—মদনাদীঘির পাড়ের নির্জনতা—সবকিছু প্যাঁচের মতো জড়িয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করছিল এখন।

সুপর্ণকুমার বন্ধু কাঞ্চনের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বোতলটা মদনাদীঘির জলে আছড়ে পড়ে এক গম্ভীর শব্দ তোলে। সেই শব্দ কানে ধরে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর দুটো পায়ে ভারসাম্য আনতে-আনতে বলে, আমরা বৈষ্ণব। তাই মাংস ছাড়াই মায়ের আরাধনা হয়। তাই বলে সুরাপান বাপু আজকের দিনে দোষের কিছু নয়। দেখবি চল, খুড়ামশাই ছাদে বন্ধুদের সাথে আসর জমিয়েছে।

উঠে দাঁড়ায় কাঞ্চন।—আর দাদু?

—দাদু? শেষ প্রহরে মায়ের প্রসাদ নেবে পাঁচ ফোঁটা। এবার ছাট বৃদ্ধ প্যানডেলের সামনে ইজিচেয়ারে নেই—তাই কেমন সব ফাঁকা-ফাঁকা—একা ছোটো পিসেমশাই হারাধন মাস্টারের তাস হাতে চিল্লামিল্লি। শালা ভাল্লাগে না!

কাঞ্চন বলে, চল—দুটো রিল খেলি—সেই হস্টেলে খেলতাম, এখন তো সময়ই পাই না।

—তা হলে এক্ষুনি। রাতে নয়।

– কেন?

—রাতে ওই আসর উঠে যাবে ছাদে। তখন পয়সার ছড়াছড়ি।

—জুয়া?

– হুম-হুঁ—ভেবেছ কী? খেলবি? ব্যবস্থা করব?

—না।

বামুনপাড়ার ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে সুপর্ণ বলে, এই যে ওই ঘরগুলো—বামুনপাড়া। দীননাথ দুই বামুন এনে বসিয়েছিল কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়ে। প্রায় শখানেক রাঢ়ীবামুন দাপাদাপি করত এখানে ওই দুই থেকে বেড়ে। এখন ফাঁকা। কোথায় যে গেল সব! এদেরই একটাকে দেখবি রাতে পুজো করতে। ভুবন ভটচাজ। শালা মাল। বাবার এক নম্বর চামচা।

মোটা আলের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে দুজন। দুদিকে কার্তিকের ধানখেত সেজে বসে আছে। গ্রাম্য মানুষগুলির আশা-নিরাশাকে বুকে ধরে নিয়ে রহস্যময়ী–দেমাকি। যেন লুকিয়ে রেখেছে রহস্যকৌটো মানুষকে নাচানোর জন্য!

উপবাসী সনাতন গরদ গায়ে জড়িয়ে বসেছিল এক কোণে দেবীপ্রতিমার সামনে। কাঞ্চনকে দেখে বলে, জল-টল খাবা হয়েছে বাবা? কিরে সঁপা—তোর বন্ধুর খাবা-দাবা ঠিকমতো—

বিনয়ী কাঞ্চন নত হয়। ও আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, মেসোমশায়। আমি ঠিক—

ছাদের একটি ঘরে ভিডিওর সামনে বউ-বাচ্চাদের ভিড়। গুহ-রায়চৌধুরীদের নিজেদের ব্যাটারি-চালিত কালার টিভি। খড়গপুর থেকে ভি. সি. পি আর ক্যাসেট ভাড়া করে এনে জেনারেটরে চালানো হচ্ছে আজ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গ্রামের সাঁওতাল-ভূমিজ কিশোর-কিশোরীরা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মিঠুনের ডাইলক-নাচা-গানা-ফাইটিং দেখছিল। এটা শেষ হলেই হবে ত্রিদেব—ওয়ে ওয়ে……নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছিল তারা খেঁচড়ি আর বৈতাল ঘণ্টের। আহ্-হা—

নীচে জোড়া ঢাক একসঙ্গে গর্জন করে উঠল।

মাইকে গান চলছে। এখন, হামে তুমসে প্যার কিত্‌না এ……

কানের কাছে মুখ এনে কথা বলতে হয়। মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে কথা শুনতে হয়। দূরে গ্রাম আর মাঠের সীমানায়, মদনাদীঘির পাড় থেকে কতকগুলি শেয়ালের হুক্কা-হুয়া ভেসে এলে গ্রামের সমস্ত কুত্তা সমস্বরে ঘেউ-ঘেউ করে জবাব দেয়। গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলে।

গড়িয়ে-গড়িয়ে রাত বাড়তে থাকে স্ফূর্তি আর উত্তেজনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

মদনাদীঘিতে তখন রাত প্রায় দুটো। একতলায় নিজের ঘরে খাটে বসে মায়ের প্রসাদ খাচ্ছিল সনাতন। পুজো শেষ হয়ে গেছে। এখন গ্রামের সবাই প্রসাদ পাবে। খবরটা দিল গগন কড়া এসে। —মামা, ছোটো পঞ্চাৎ কুমিদ দাস—

—কাই?

—প্যাণ্ডেলে, জামাই মাউসার সাথে কথা কয়—

জেনারেটরের আলো এ ঘরেও এসেছে। আলোর চাপে রক্তিম নেত্র আলতো ফাঁক করে সনাতন। —হারামির পো এখানে কেন? কুন শালা ডাকছে? হারাধন ত নেতা-মাস্টার—ফের গ্রামেরই ইস্কুলের। কথা তো কইবেই। কিন্তু মোর বাউনডারিতে কেন?

—মায়ের প্রসাদের তরে গটা গেরামকেই ত ডাকা হয়। প্রত্যেকবার সকলে আসে—। দাঁত কেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গগন, ইট-বেরিয়ে-থাকা জীর্ণ দালানের মতো।

—অ। দাঁড়ে আছু কেন? যা খাতির কর—

—যাই তবে?

—হুঁ, শুন—

—কাল কে. জি. ও মোর এখানেই উঠবে। সুতরাং কুমিদ হাবা বুঝতে আসসে! হারাধন কি কথা কয়? টিপে দে, যা—

জামাই হারাধনকে ডেকে তার মোটা ভারি কানে মুখ গুঁজে কিছু কথা বলে গগন কড়া। তারপর বাইরে বিশাল খোলা উঠোনে মাটিতে উবু হয়ে বসা প্রসাদপ্রার্থীদের পশ্চাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত হয়। —এ যে ইদিকে প্রসাদ—খেঁচড়ি – বৈতালের ঘণ্ট—আলুর দম—পিফার টক—মিহিদানা—

মাথার উপর চাপ-চাপ অন্ধকার। তার উপর নক্ষত্র। অন্ধকার হিম হয়ে কার্তিকের ভোরের ঠাণ্ডা নিয়ে টুপ-টুপ খসে পড়ছিল। ধানখেতে খেঁকশেয়াল মুখে আগুন নিয়ে ছুটছে। জেনারেটারের ঠকঠক শব্দের ভেতর দিয়ে ওই জন্তু খ্যা-খ্যা হাসছে। ছাদের ঘর থেকে জানালা দিয়ে আলোর মণ্ড আর ওয়ে ওয়ে উপচে পড়ছিল।

মাঝারি খড়ের গাদাটার ওপাশে ভরা পেট নিয়ে কুমিদ দাস কার সঙ্গে গোটাকয় দরকারি কথা বলে নিচ্ছিল চটজলদি। এঁটোপাতা ফেলতে গিয়ে গগন কড়ার চোখ দেখল মেয়েমানুষ।

মন বলল, জেনারেটারের আলো।

চোখ বলল, সাঁওতালপাড়ার পিতু সরেনের ঝি মান্‌অ।

মন বলল, মামা ডাকে সে পাশে।

এ দিকে মায়ের পূজার হৈ-চৈ-এর মধ্যেও একটা অস্বস্তি বাতের ব্যথার মতো সনাতনকে জ্বালাতন করে। সূর্য ওঠার আগেই প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেছে।

বারান্দায় সাবেকি বেনচে বসে সমাতন ঠায় তাকিয়ে ছিল দূরে। বাঁশজঙ্গল, অর্জুনগাছের ফাঁক দিয়ে চোখ চলে যাচ্ছিল বিস্তৃত ধানখেতে। মাঠ শুয়ে আছে যতদূর চোখ যায়। সনাতন দেখল, হাতি-ঘোড়ার বিশাল শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। পীতাম্বর গুহ বালীকোতরং থেকে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে জগন্নাথবিগ্রহ দর্শনে চলেছে। আদিম অমূর্বর মস্তিষ্কের কৃষ্ণবর্ণ জীবের দল রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে সেই সমারোহ দেখছে। ফেরার পথে রক্তের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজয়ী পীতাম্বরের অভিযান। নিহত হরিপালের শবের উপর দিয়ে ছুটছে ঘোড়ার খুর! হরিপালের রাজত্বে অভ্যুদয় ঘটল গুহদের।

সন্ধেয় কে. জি. ও আসবে। এসে উঠবে এখানেই। যেখানে বহিরাগত ভদ্রলোকেরা আবহমানকাল ধরে উঠে এসেছে। গগন কড়া গেছে পুকুরে বড়োজাল টানতে। অন্যমনস্কভাবে নিজের মাথার পাকা চুল তুলছিল সনাতন।

শালা, লোক কেমন হবে কে জানে!

পীতাম্বরের গজম্বরে বাতাস কেঁপে ওঠে যেন, রতনা—

ছোটো ভাই রতন বলে, অত ভাব কেন, দাদা?

—ভাবি কি আর সাধে? পিতুটাকে নিয়ে চিন্তা। অরে লাচায় ছোটো পঞ্চাৎ কুমিদ। পিতু-কেতু দু-ভাই মিলে তেরো বিঘা ভাগচাষ করে। বাকিগুলান না হয় যা হবার হবে। খালধারে নাবালের জমি রে, রতন। তাদের ধান্ধা কি বুঝু তুই?

—কাদের? পার্টির? জামাই বলল, বিঘা তিরিশেক বর্গা করাবেই।

—বিঘা তিরিশ কি সবসুদ্ধা ভাগে আছে?

—যেগুলা গত বছর পয়সা খরচ করে ছাড়াইছ, সেগুলাও হিসাবে ধর—

—অরা ত খুশি মনে ছাড়ে দিল!

—জামাইয়ের রিপোর্ট। কুমিদ কয় সেসব ও লিখাবে।

—তার মানে জংলিপাড়া! যারা মণ্ডল পিতুর কথায় উঠে বসে!

—হুঁ।

—পিতু তাইলে জোর করে ধান কাটবে?

—পিতু কি কাটবে? কাটবে শালা কুমিদ। কত করে কইলাম তখন পার্টি পলিটিক্সে যাবার দরকার নাই। ভোটে হারে প্রেসটিজের বারোটা বাজল, তার উপর পার্টির রাগ জমল তমার উপর। নাইলে চাঁদা দিয়ে আবদার শুনে আজ বিশ বছর খারাপ কি আর চলছিল? গোড়ার দিকে যা যাবার তা ত গেছে বাবার হাতেই।

—বাবার শরীর কেমন?

—ভুল বকে—ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে রক্ত দেখে আঁতকে উঠে কাল থিকে—এ যাত্রায় বোধ হয় গেল—সম্মুখের শীতেই!

বড়ো বিমর্ষ দেখায় এখন সনাতনকে। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এ বছর কত জমি পতিত ছিল, রতন?

—একুশ। আমি কি গগনকে দিয়ে একটু আলোচনা করে দেখব?

—না। খপরদার না। শালাদের দৌড় দেখব। মোর কি হামারে ধান উপচে পড়ছে? যে, পতিত রইল একুশ বিঘা? ইসট্রাইক! ভিখারির পো কুমিদ দাস, অকে আমি দেখে ছাড়ব। মাহিষ্যর বাচ্চা হারামি!

গর্জন করে ওঠে পীতাম্বরের বংশধর।—গগনা এতক্ষণ কী করে পুখ্‌রে?

—মাছ যে সব জলের তলায়!

—দু-চারটা বেশি করে ধরতে বল। কুটুম-বাটুম সব আছে। কৌশল্যার দোকান থিকে রামা আসসে? বন্ধ করে দিয়ে আসতে কতক্ষণ লাগে?

—সে হবে। তুমি স্নান করে ঘুমে লও একটু। ভাবতে হবে নি। এ জমানায় আছে যখন থাকবে। আইনের ফাঁক আছে। চাষ গেলে ব্যাবসা থাকবে।

রতনের কাঁধে গামছা। সে পুকুরের দিকেই যাচ্ছিল, যেখানে জাল টানা হচ্ছিল। উঠোনে নেমে গিয়েও ফিরে আসে।—দাদা—

—কী?

—ঘরে কইছিল বাপের ঘর যাবে—ভাইফোঁটা!

—কে? বউমা? তোর মাথা খারাপ? কি কইছু? যাবা হবে নি। সকলকে থাকতে হবে। কঁতাই মৌজার সাত বিঘা কার নামে ভুলে গেছে সে? বাপের ঘর থিকে পাবা যৌতুক হিসাবে দলিল করে রাখছি। যদি কেউ বাগড়া দেয়?

শান্তিপুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রতন চেঁচায়, ভায়া—গগন উঠে আসে।—কও ছোটকামামা—

—পিতু সরেন।—

—কে? মোর বন্ধু? কিছু ভাবতে হবে নি। বড়োমামাকে কয়ে দিবে, মুই দেখব।

'জল-বিদ্ধা' চুলকোতে-চুলকোতে গগন ব্যাঙের মতো আবার জলে নামে। রাতের নেশা এখনো কাটে নি। তার উপর পুকুরে নাবার আগে দু-টিপ গাঁজা মেরেছে গগন কড়া। সুতরাং বেশি ঘাঁটালে যদি বেফাঁস কিছু বলে বসে সে! রতন সরে পড়ে। অন্যত্র তার কাজ আছে। এইজন্যই লোকটার পেছনে বেশি খরচ করেও পুষিয়ে যায়। কথাবার্তার গুণে। তিন পুরুষের মাইনদার এই গগন। তুলসীচরণের যৌবনে বাগাল হিসেবে গুহদের ফ্যামিলিতে অ্যাপয়েনমেনট পেয়েছিল—আর সুপর্ণর সন্তানের আমলে রিটায়ার করবে। গগনের বাপ কত্তা এবং ঠাকুরদা ভূষণ একই ভাবে এই পরিবারে খেটে গেছে। জিনিস কাজে লাগলে তাকে যত্নে রাখতে হয়। কাজে না লাগলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। খাঁটি বস্তুর মতো এইসব গগনেরা সুন্দর ব্যবহৃত হয়। এসব কথা গুহদের সবাই জানে পুরুষানুক্রমে।

রতন পুকুরপাড় থেকে আলপথ ধরে। দুদিকে জমি। ধানে ফুল ধরেছে। পুজোয় বৃষ্টি দিয়ে মস্ত উপকার করেছে। এখন কাত্তিকা ঝড় না হলেই হয়।

তারই মধ্যে ধান শক্ত হয়ে যাবে। তিন বিঘা জমি ভাগেও চাষ করে গগন। কিন্তু কোনো দিন নিজের নামে লেখাতে যায় নি। বলে, অধর্ম হবে! এদিকে ভেস্টেট ল্যানডে পাট্টা বিলি আর মুনিসের রেট নিয়ে মাথা ঘামায় পরিষ্কার। বলে, মুনিসের রেটটা বাড়া দরকার, মামা। অদ্ভুত এর চরিত্র! অদ্ভুত এর অবস্থান! কেউ শত্রু বলে ফেলে দেয় না, কেউ বন্ধু বলে খাতিরও করে না। কেবল যে যার মতো কাজে লাগায়।

তা হোক! গগন রতনের কাজ করলেই হল। সে তাই নিশ্চিন্ত মনে বড়ো ভাই সনাতনকে ভরসা দেয়।

কে. জি. ও তালধী গ্রেট হারামি। লোকটাকে দেখেশুনে সনাতন কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। তবে বংশের গুণের কথা ভেবে আতিথেয়তার দিকে নজর রাখল। খাওয়া-থাকার পয়সা দিতে এলে নিল না। বরং চমকে উঠল কিছুটা। আজকের দিনে এই লোক! এ লোককে পয়সায় কেনা যাবে না। কিংবা ঘুষুরের পো পার্টির লোক। তখন সনাতন বৃত্তান্ত শোনাল—গুহদের বৃত্তান্ত—মদনা-দীঘির বৃত্তান্ত। কিভাবে পাঁচ ডেসমেলের মদনাডোবা পাঁচ হেক্টরের মদনাদীঘিতে পরিণত হল। খোঁড়ার সময় প্রাচীন সংস্কৃতির কত চিহ্ন বেরিয়ে এসেছিল! দ্রাবিড় অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর সভ্যতার কত বিচিত্র নিদর্শন! যেসব এখন তমলুক শহরে তাম্রলিপ্ত মিউজিয়ামে আছে। পরম বৈষ্ণব মধুসূদন তার পুত্র বৈকুণ্ঠ গুহ কিংবা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর আগমন—উনিশশো চব্বিশে কমলাকান্ত চৌধুরী রায়বাহাদুরের

পরিচালনায় মহাহিন্দুধর্ম সভা ইত্যাদি। গল্প বলবার সময় সনাতন পীতাম্বরের ঘোড়ার রক্তাক্ত খুর দেখতে পাচ্ছিল। প্রাচীনতার ঘন অন্ধকারে কে. জি. ও যে ডুবে যাচ্ছিল ক্রমশ তাও বুঝতে পারছিল পীতাম্বরের বংশধর। ঠিক সেই সময় গগন কড়া এসে বলে।

মামা—চলেন—মামি ডাকেন—

খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় হয়েছে তার মানে।

এরই ফাঁকে কুমিদ দাস সদলবলে আলাপ করে গেছে কে. জি. ও-র সঙ্গে।

পরের দিন গুহদের বারান্দায় পাট্টা পড়চা দলিল রসিদ কাগজপত্র নিয়ে দলে-দলে হাজির হল মানুষ। হলকা ক্যাম্পো। সাক্ষীসাবুদ—জেরা—হিসেব মিলিয়ে নেওয়ার কাজ।

অ্যালা মৌজা ধরতেই বুক কাঁপতে শুরু করে সনাতনের। সবাই আছে। ক্ষুদ্র চাষি—জোতদার—বর্গাচাষি—ভাগচাষি। প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে। এই মৌজায় সনাতনের সর্বমোট আঠাশ বিঘা ভাগে চাষ করে লোকে। কোনো-কোনো প্লটের উপর কেস চলছে। হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশান দেওয়া আছে। দেবোত্তরেরও উপর কেস চালাচ্ছে সরকার। অভিযোগ—এইসব সম্পত্তি দেবতা নয়, গুহদের নিজেদের সেবায় লাগে।

দূরের মৌজা। হাতচাষে খরচে কুলোয় না। তাই ভাগে দেওয়া ছিল সব। চাষি ভাগ-ধান দেবে, মালিক রসিদ দেবে। কিন্তু তারা সব বর্গা লেখাবে। বাগ মানবে না! কারণ কুমিদ দাস! দানবের চেয়েও ভয়ঙ্কর!

একটা কষ্ট মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল সনাতনের বুকে-মাথায়। একটাই চিন্তা—গেল পঞ্চায়েতে কেন যে মরতে দাঁড়াতে গিয়েছিল সনাতন? এমনিতেই প্রতি বছর শ্রাবণ-ভাদ্রে আবাদের সময় কিংবা অঘ্রান-পৌষে ধানকাটার সময় একটা সংঘর্ষ হয় কুমিদরা বনাম গুহদের মধ্যে। তখন গুহরা দেমাক দেখাতে গেলে মদনাদীঘি কেঁপে ওঠে। মাটির ভেতর থেকে কী সব বেরিয়ে আসতে চায়। বন্দুক বনাম তীর-কাঁড় মুখোমুখি হয়। নেতারা বলে, স্ট্রাইক। খেতমজুরেরা বলে, ইনস্ট্রাইক। রাতের অন্ধকারে পাছায় চাপড় মেরে একচোট নেচে নেয় কুমিদ দাস—

সাকসিস—সাকসিস।

পীতাম্বরের বংশধরেরা বদনে জলধর ঝুলিয়ে হামারে উঁকি মারে। লে শালারা, পেটে ভিজা ন্যাকড়া দে। এখনো যা আছে বিশ বিঘা পতিত থাকলেও ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে খাব।

খেতমজুরেরা বলে, কুমিদভাই ফয়সালা কর—

আয়োজন হয়। ফল পাওয়া যায় না। এসবের যোগসাজসে ওরে গগন কড়া—

জংলিরা এখন খেতমজুর। যেমন জমিদার গুহরা জোতদার। আষাঢ় থেকে আধ-পেট-খাওয়া জ্যান্ত কঙ্কাল সাঁওতাল ভূমিজ কড়া বাগদিদের সহিষ্ণুতা বেড়ে যায়। বাড়িয়ে দেয় কুমিদ দাস।

অথচ মানুষের মনে আনন্দ নেই। মোদের পেটে ভাত নাই—নেতা কুমিদের ফুটুনি কেন? কুলোকদের বয়ান অনুযায়ী কুমিদের গায়ে গন্ধ ছাড়ে। কুমিদের ভাই হামিদ যে গরিবদের মুনিসের বিনিময়ে দাদন দেয়! সস্তায় মুনিস পাওয়া যাবে ধান-কাটার সময়!

এদিকে কুমিদ বলে, হারামির বাচ্চা সন। গুহ রতনা গুহ! শালাদের দেখে লিব। দালালের ব্যাটা দালাল গগন কড়া—আইলে হয় একবার—মাথা খাব।

গুহদের সদর গমগম করছে। হাটপাড়ার মতো। সদ্‌গোপপাড়ার ভূপতি পান সিরাজ আলিকে বলে, মিঞাভাই, পকড়িভাজার দকান দিলে হেবি সেল হত ক?

সিরাজ আলি ভূমিজপাড়ার হরি সিংকে বলে, অনেক দিন পকড়িভাজা খাই নি!

হরি সিং একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

সনাতন গুহ ঘরের ভেতরে উঠে যায়। সাক্ষীরা

সব ঠিক-ঠাক চাষিকে চিনিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পিতু সরেন কেতু সরেন জিন্দাবাদ।

সকলের অলক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল গগন কড়া। স্থির অনড়। প্রাচীন সৌধের মতো। অতীতের গন্ধের মতো হঠাৎ কে জানে কেন একটা খুশির রঙ তার সর্বাঙ্গে খেলে গেল। এই সংবাদ শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই, বিদ্যুতের মতো।

না, সত্যি-সত্যিই এই মুহূর্তে তার দিকে কেউ তাকিয়ে নেই।

—গগ্‌না—

—যাই মামা—

একটা খুশির বাতাসে পাক খেতে-খেতে বুড়ি-তুলোর মতো হালকা মন নিয়ে গগন সেদিকে এগিয়ে গেল।

দুই

ধানকাটার ঠিক আগে-আগেই একটা ভয়ানক রিপোর্ট, এমনকী গুহদের রক্ত জল হবার মতো খবর জে. এল. আর অফিস থেকে বের করে নিয়ে এল কুমিদ। আঁচ করতে পারলেও গুহরা তদ্বির চালিয়েছিল যাতে দেরিতে আসে। সেটা বুঝতে পেরে মেহনতি মানুষের স্বার্থে সমদরদি কুমিদ দাস উপর মহল থেকে চাপ দিয়ে বের করে নিয়ে এল।

এলাকার তাবৎ ভূমিহীন হাতে চাঁদ পাওয়ার বাসনায় প্রতীক্ষায় থাকল। গোপালজীউর নামের বিয়াল্লিশ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তির আয় দেবসেবায় ব্যয় হয় না। গুহরা নিজেরা ভোগ করে।

এদিকে তুলসীচরণের ডিক্লারেশান দেবার পর বহু জমি বেচে দিয়েছে গুহরা। সিলিং-এর বাইরের সেই-সব জমি ভেস্ট হয়ে গেছে। বর্তমান চাষি ধান তো কাটবেই এ বছরে। আবার ক্রেতাদের টাকা ফেরত নিতে হবে। গুহদের সেই টাকা ব্যাবসায় খাটছে।

সনাতনের মাথায় হাত।

গগন বলে, কিছু ভাবতে হবে নি, মামা—মুই ম্যানেজ করব।

—তুই বলেই খালাস। কুমিদ মোর মাথায় চাপল।

দু দিকে দু পক্ষ তৈরি। গুহরা হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশান বের করতে পারল না এত তাড়াতাড়ি।

গগনকে ডেকে সনাতন বলে, তৈরি থাক, ভায়া। আগেভাগে সাঁওতালপাড়াটাকে ম্যানেজ কর। তোর সাঙাৎ পিতু সরেন। পিতুকে একবার ডাক—

পিতু বাবুদের বহুদিনের পরিচিত। সে এসে দাঁড়ালে রতন বলে—

বস না ভায়া—দাঁড়্যা কেন?

—ঠিকাছে কচিমামা—কথা কী? কও—

—দাদা নামজপে ব্যস্ত। একটু বস। চুটা খা—

হ্যারিকেনের মৃদু আলো। জমাটি শীতের ঠাণ্ডা। পিতু উশখুশ করে।

সনাতন বলে, এটা কি তোর ঠিক কাজ হল, পিতু?

—কী?

—তোর সঙ্গে কি মোর শত্তুরের সম্পক্ক?

—কী যে কন, মামা!

—আলাপ-আলোচনায় আয়। মোর সব যে যাতে বসসে।

—বলেন। তবে এ বছর ধান তুলব মুই।

এমন সময় ভুনাই হাঁসদা প্রায় হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে পিতুকে ডেকে নিয়ে যায় আড়ালে।

ফিরে এসে সে বলে, মামা, পরে হবে। এখন আসি।

সনাতন উঠে দাঁড়ায়। মুনিসের বাচ্চা—জংলি পিতুর এত দেমাক! পীতাম্বরের বংশধরের মর্যাদা সনাতন গুহর চওড়া সাতান্ন বছরের প্রাচীন বুকের খাঁচার ভেতর ডানা ঝাপটাতে থাকে। মরেও না, বেরিয়ে যেতেও পারে না। ফুঁসতে থাকে সে।

—দাঁড়া-দাঁড়া, ও পিতু—

পিতু আর ভুনাই তখন বাঁশ-কাঁটার আগড়ের

বাইরে বাঁশতলা পেরিয়েও অনেকটা চলে গেছে।

—রতনা—

—দাদা?

—থানায় আগেভাগে একটা ডাইরি করে রাখ। অফিসার পার্টির কথা শুনে চলে। সুতরাং বেশি লাগবে। যা আছে সব সঙ্গে নিয়ে যা। আগে কুমিদের বিষদাঁত ভাঙি!

কুমিদ তাঁর দাঁত নিজেই ভেঙে বসে আছে। আবার সেই গগন কড়া। গগন এসে বলে, মামা খবর আছে—

—কী? তোর খবরের কুনো মূল্য নাই।

—না মামা। ইবার ঠিক।

—ক—

—কুমিদ ধরা পড়ছে—

—কী ব্যাপার?

—তমাকে ফাঁদে ফেলবার তদ্বির করতে ঘন-ঘন পিতুর দরে যাইত কুমিদ। যাতে যাইতে পীরিত জমে। পিতুর ঝি মান্‌আ'র সঙ্গে পীরিত। অদের সমাজ আছে। জাত বসসে। ধরা পড়ছে কুমিদ। কিন্তু কুমিদ আউট—ঘরে নাই—গ্রামে নাই—বনবাদাড়ে ধানখেতে কুথাও নাই। জ্ঞানীগুণী সবাই কয়ঠে, ইটা আদিবাসী সেন্টিমেন্টি—পার্টিপলিটিক্স কামে লাগবে নি—লাশ পড়বে কুমিদের।

একটি সুখের বায়ু বনি করল সনাতন।—তারপর তারপর! যা জান্নু সব কয়ে যা—

তীরধনুক নিয়ে, মানঅকে লিয়ে সব রেডি ক্যানিল পাড়ে খালাসির ঘরের সামনে মদনার লকে। কুমিদের ঘরে তুলবে পিতুর ঝিকে। কুমিদের বউমানুষের আখাল-পিথাল কান্না গো—। পেসটিজের কথা ভাবলে ঘরে না নিতে পার, দশ হাজার জরিমানা দিতে হবে অদের জাতকে—সবাই এককাট্টা।

—আর? আর? ওরে টেঁপু—তোর মাকে কয়ে দে—পায়েস খাব। তোর বাপ কাই? রতনা—

ভাইঝি টেঁপু সনাতনের কাছে আসে।—বাবা ছাদে তাস খেলে। জ্যাঠা, এত রাতে পাইস হবে?

—হুঁ। যা। ঘরে কয়ে দে—তারপর? বলে যা ভাগ্না—

—চিল্লামিল্লি—মহাকাণ্ড!

মদনাদীঘি পঞ্চায়েতের সব মেম্বার সহ রাত তিনটার সময় প্রায় ষাট-সত্তর জন সশস্ত্র সাঁওতালের মুখোমুখি হয় প্রধান ও কুমিদ। কটা ঘণ্টাতেই শুকিয়ে কাঠ কুমিদ। শরীর আর মেজাজের সেই জৌলুস আর নেই। ভেতরের খবর, আগেভাগেই বুঝতে পেরে বড়ো পঞ্চাৎ মানে জেলাপরিষদের মেম্বারের কাছে গিয়েছিল কুমিদ। চণ্ডী জানা বলেছে, গুয়ে ঢিল মারলে নিজের গায়ে ছিটকে আসবে—আমি এসবের মধ্যে নাই—তমাদের পঞ্চায়েতের ব্যাপার প্রধানকে নিয়ে তমরা মিটমাট কর। তবে কথা দিতে পারি, মিটমাট করে লিতে পারলে এটা লিক করব নি আমি। কাজটা ঠিক কর নি।

কুমিদ মচকায়। কিন্তু ভাঙে না।

প্রধান দেখল, বড়ো ভয়ানক পরিস্থিতি। জাতের প্রশ্ন। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন। অথচ এইসব সাঁওতালেরা সবাই তাদের সমর্থক। কেউ ঝাড়খণ্ডকে ভোট দেয় না। পিতুকে কাছে ডাকে প্রধান। কুমিদ কি তার আজকের বন্ধু? তা ছাড়াও—

পিতু বলে, ছাড়ে দও শালাকে, দেখে লিই!

প্রধান বলে, এটা রাগের ব্যাপার নয়, ভাই। একটা ভুল—

—ভুল? ভুল মাগের কাছে হলে ক্ষতি কী? মোর ঝিকে লিয়ে টানাটানি কেন? তা ছাড়া, মোদের জাত বসে যা ঠিক করবে, তাই হবে। মোর ভগ্ন কুমিদের পী রত এত দিন ধরে কি এউ তরে?

—এখন রাগ বাদ দে, পিতু। তুই যা বলবি তাই হবে।

—তবে তাই কর। ঘরে তুলতে বল। নাইলে দশ হাজার দিতে বল—

—এখন নয়।

—কেন? কুমিদের টাকার অভাব কিসে?

—সেসব নয়। সামনে ধানকাটা। বড়ো ঝামেলা হবে। মোদের সবাইকে একসঙ্গে থাকে আরো বড়ো কাজ করতে হবে।

—ঠিক ত?

—হুঁ।

এ খবরও সনাতনের কানে পৌঁছে দিল গগন কড়া। বিকেলের আলোর মতো একটা মন-খারাপ আলাতন করছিল তাকে। ভোরবেলা। সূর্য উঠবে। ধানে বাঁশ দিতে বেরিয়ে গেল গগন সনাতনের ওই মন খারাপের উপর দিয়ে হেঁটে। সূর্যের লাল আভার মতো একটা রঙ সনাতন গুহর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল। এ বারে সব ধান যে তার অন্যের খামারে উঠবে। তা ছাড়া এত টাকা?

টাকা? কত? কত দিতে হবে পিতুকে কুমিদের? দশ হাজার! বাপরে বাপ! ধানের হিসেব বাদ দিয়েও চাষিদেরকে কত টাকা দিতে হবে সনাতনের? যেসব ভাগচাষীদের সঙ্গে সমঝোতায় এসে কিছু-কিছু টাকা নিয়ে জমি রেজেষ্ট্রি করে দিয়েছিল তাদের নামে সনাতন? তারা তো সব লেহ্য মূল্য চাইছে। বর্তমান বিঘা প্রতি যা দাম বাজারে।

রতনা—

—দাদা ডাক?

—হুঁ।

—কেন?

—কুমিদকে ডাক্। গগনাকে পাঠে দে—

—কুমিদকে।

—হুঁ।

—আসবে?

—ওর বাপ আসবে।

ধূর্তামি স্প্রিং-পুতুলের অবয়ব নিয়ে সনাতনের ঋজু শরীরে লাফালাফি করতে থাকে এখন। হেমন্তের বেলা পুইয়ে যায়। এরপর একটা তেন্দড় সময় মদনা-দীঘির উপর উপুড় হয়ে পড়তে চায় বিধ্বস্ত বাজের মতো। এক পচা আদিম গন্ধ মানুষের গা থেকে চুইয়ে পড়ে কামুক লালায় চটচটে করে দেয় চতুর্দিক।

বড্ড পিচ্ছিল সময়। পায়ে পা জড়িয়ে যায়। পিছলে যেতে থাকে পা। ঘরের ভেতর থেকে প্রাচীন বৈষ্ণব তুলসীচরণ বিকারে চেঁচাতে থাকে। দুধ-জল-ফল-বাতাসা—সব তার একসঙ্গে চাই। হাতির ডাক শোনে সে। ঘোড়ার খুরের ধুলো দেখে। রক্তের গন্ধ পায়। মুশকিলে পড়েছে গগন কড়া!

রাতের অন্ধকারে মুখোমুখি দুজন। লুচি মিষ্টি সিগারেটের প্যাকেট।

—কই হ্যায় গগন কড়া—

—যাই মামা—

জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরের আলো-আঁধারির রহস্যে চোখ রাখে গগন। এ কী! একই রঙ? একই গন্ধ? একই স্বাদ?

বুকের উপর দিয়ে একটা লজঝড়ে বৃদ্ধ সাইকেল তার ভাঙা বেল বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে যায়। দম নেওয়া কষ্টের হয়ে ওঠে। ঠিক-বেঠিকের তাৎপর্যগুলো এত সহজে মস্তিষ্ককে ঘিরে ধরাতে পারে? তা না হয় হল। এমন মস্তিষ্ক পয়দা হল কোন্ সুযোগে, সে প্রশ্নও ভিন্ন। কিন্তু কী করবে এখন গগন কড়া? সময়-পৃথিবী-মানুষ তবে এত কষ্ট আর ঘৃণা মানুষকেই দিতে পারে একইসঙ্গে? এ সব কী অনাসৃষ্টি? ফুল ফুটেছে কি বাঁশগাছে? উঁকি দিয়েছে কি মানুষকে মেরে ফেলতে ধূমকেতু পঙ্কিল আকাশে? গগন কড়া দেখল, দুটি জন্তু যেন মুখোমুখি ভাগ বাঁটোয়ারা করে আপন মনে শিকার ভক্ষণ করে চলেছে!

—জল নিয়ে আয়, গগ্না—

বিকল যন্ত্রের মতো কঁকিয়ে ওঠে গগন।—আসতিছি মামা—

রান্নাঘরে গিয়ে সে বলে, মামি গো, মাথার উপর কালপ্যাচা! ওঁক ওঁক ডাকে! আঁইশা বঁটিটা উনানে

গুঁজে দও তো—

এ ছাড়া মদনাদীঘিতে আর সব ঠিকঠাক। কেবল বাইরে হিম-ভর্তি রাত পৃথিবীর উপর চেপে বসতে চাইছিল। সেখানে হাঁটা-চলা-করা মানুষ চিড়ের মতো চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ অজানতেই।

হাঁফিয়ে উঠছিল গগন কড়া। একটা উত্তেজনার স্রোত পর্যুদস্ত করে দিচ্ছিল তাকে। ভাটায় ভেসে থাকাও যায় না। ফের উজিয়ে আসাও যায় না। দম নিতে বড়ো কষ্ট হচ্ছিল।

সাঁওতালপাড়া থেকে কোনো আমোদ উপলক্ষে হাঁড়িয়া আর মাদল-ধামসার হুটোপুটি মানুষকে চমকে দিয়ে যায়।

একটা নিঃশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল গগন কড়া। সেটা তার নিজেরই!

তখন অনেক রাত।

চরাচর শুনশান। কেবল কয়েকটা মত্ত কুত্তার চাঞ্চল্য। ধানখেত বড়ো মায়া নিয়ে শুয়ে থেকে নক্ষত্রদের আদর খাচ্ছিল।

অসময়ে সাঁওতালপাড়ায় হোলিখেলা চলছে। গায়ে-গায়ে-লেগে-থাকা পচা খড়ের চালগুলি থেকে সেই খুশির ঢেউ উপচে পড়ছে। আবিরে কুমকুমে রেঙে উঠবে অধুনা ছিটকে এসে পড়া ভারতীয় দেশী অনুর্বর মস্তিষ্কের কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলি।

কেঁপে-কেঁপে উঠছে বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যে জরাগ্রস্ত মদনাদীঘি। তার তলার আদিম সভ্যতার ঐশ্বর্য হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে যেন জেগে উঠতে চাইছিল।

অপ্রকৃতিস্থ ক্লান্ত মানুষ-মানুষীগুলি সব ঘরের ভেতর অসাড় নিথর।

কেন এমন হয়? তবে কি সত্যই এখন মরে যাবে গগন কড়া? গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গাছের সঙ্গে সে যখন সঙ্গম করছিল অসহায় দেহ নিয়ে, অনর্গল রক্ত তখন বেরিয়ে এসে তাকে ক্লান্ত করে দিয়ে যায়। এক অস্পষ্ট বাসস্থানে অপর্যাপ্ত আলো ও বায়ুর সরবরাহে রাত-দিন নিদ্রা-জাগরণের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে গগন কড়া তাকাবার চেষ্টা করল।

·· একটা ফাঁস নেমে আসছে। এগিয়ে আসছে সাপের চকচকে বিভীষিকা নিয়ে। কয়েকটি শেয়াল মুখে আগুন নিয়ে এলোমেলো ছুটছে। তার মাঝখানে কুমিদ দাস।

মদনাদীঘির বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তখনো বেঁচে ছিল গগন কড়া।

পুলিশ প্রধান এবং ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার স্পটে উপস্থিত। স্পটে পোড়া গৃহ—পোড়া অস্থাবর জিনিস—পোড়া জীবজন্তুর ধ্বংসস্তূপ। স্পটে পীতাম্বরের বংশধরেরা—বেঁচে যাওয়া গোটাকয় সাঁওতাল—কিছু ভূমিজ বাগদি-মাঝি-কড়া-বামুন-মুসলমান—কান্নার মধুর গুঞ্জন—পোড়া মানুষ আর জীবজন্তুর সুমিষ্ট গন্ধ—কুমিদসহ অন্যান্য পঞ্চায়েত মেম্বারেরা। সবাই শোকাভিভূত। কয়েক হাজার মানুষের আধুনিক সভ্য পায়ের ভারে মদনাদীঘির ভেতরের প্রাচীন প্রাণটা মরে যেতে পারলে যেন বাঁচে!

সাক্ষী গগন কড়া।

প্রধান বিবৃতি দেয়, অসম্ভব।

পুলিশ বলে, মানে?

—এই যে দেখুন কাগজপত্র। ভোর পর্যন্ত মিটিং চলেছে। মদনাদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত মেম্বারেই উপস্থিত ছিল। এটা নেহাতই দুর্ঘটনা।

পুলিশ বলে, আচ্ছা আচ্ছা—

ধানভরতি মাঠের দিকে তাকিয়ে আকাশে মুখ তুলে একটা মস্ত হাই তুলল গগন কড়া।

একটা শব্দে সমবেত জনগণ কান খাড়া করে তাকায়। তারপর যে যার নিজেদের আলোচনায় ব্যস্ত হয়।

কিছু না। গুহদের বাঁধা লোক গগন কড়া দাঁড়াতে-দাঁড়াতে পা হড়কে পড়ে গেছে। উঠে বসলেই ঠিকঠাক।

স্মরণে

সৈয়দ সাদত আবুল মাসুদ

গৌরী আইয়ুব

মাসুদ সাহেব ইহলোক ত্যাগ করায় বাঙালি জীবন থেকে নিরহঙ্কার ভদ্রতা এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুতার অনেক খানি হারিয়ে গেল। সদ্য-প্রয়াত এই বন্ধুটির সঙ্গে যদিও এক প্রজন্মকালের পরিচয় তবু তাঁর নামের ইংরেজি আদ্য অক্ষর দুটির পিছনে সম্পূর্ণ আরবি নামটি যে কী, তা জানা ছিল না। মাত্র বছর দুয়েক আগে একদিন কৌতূহল প্রকাশ করায় তিনি এই শিরোনামটি বলেছিলেন। বলেই অবশ্য আবার যোগ করেছিলেন যে 'সৈয়দ' পদবীটি তিনি ব্যবহার করেন না, কারণ 'সৈয়দ' বলে দাবি করবার মতো গুণ কিছুই নেই তাঁর মধ্যে। শুধু 'সৈয়দ' বংশে জন্মালেই কি 'সৈয়দ' হয়? অতএব তিনি কেবলমাত্র সাদত আবুল মাসুদ নামে পরিচিত হওয়াই পছন্দ করেন। শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

বলা বাহুল্য, এতে তাঁর হীনম্মন্যতা নয়, আত্ম-বিশ্বাসই প্রকাশ পেয়েছিল। পিতৃ-অর্জিত আভিজাত্য কিংবা বংশগত কৌলীন্য—কোনোটাই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে দাবি করেন নি। কারণ তাঁর চারিত্র্যে স্বোপার্জিত আভিজাত্য যথেষ্টই ছিল। তারই অধিকারে ভাষাধর্মবিত্তনির্বিশেষে অসংখ্য হৃদয়ে তাঁর জন্য একটি শ্রদ্ধার আসন করে নিতে পেরেছিলেন। অমায়িক, নির্বিরোধ এবং দরাজ মনের মানুষ ছিলেন বলে মাসুদ সাহেবের সান্নিধ্যে একটা আরাম পাওয়া যেত। কখনও দেখেছি কারুর কটু আক্রমণে অত্যন্ত আহত হয়ে সহানুভূতি প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু কটু প্রত্যাঘাত করেন নি। চতুর্দিকে আজ ব্যক্তিমানুষ এবং যূথবদ্ধ মানুষ এতই মারমুখী যে এর মধ্যে তাঁর স্বভাবজ ভদ্রতাকে দুর্বলতা বলে মনে হয়েছে অনেকের। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব অর্থেই তাঁর চেয়ে হীন অথচ দুর্বিনীত, এমনকী তাকেও কখনও আঘাত করতে তাঁকে দেখি নি—আদ্যোপান্ত এতই তিনি ছিলেন ভদ্রলোক।

তাঁর সঙ্গে ১৯৬৪ সালে আমার পরিচয় করিয়ে দেন মৈত্রেয়ী দেবী—তখন আমিও নতুন-নতুন যাচ্ছি তাঁর পাম অ্যাভেনিউর পুরানো বাড়িটায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সভায়। সেই সময়ে শ্রীনগরের হজরৎ বাল মাজার থেকে নবীর পবিত্র কেশ খোওয়া যাবার ব্যাপারটি উপলক্ষ করে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে এবং তার পরে পশ্চিম বাঙলা ও বিহারে নৃশংস দাঙ্গা হয়। যে-কোনো হত্যাকাণ্ডই বেদনার। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শুধু মানুষ মরে না, মনুষ্যত্বও মরে—এই কথাটা তখন বলেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। সাম্প্রদায়িক হানাহানির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের চিন্তাভাবনাও ভয়াবহভাবে বিষিয়ে যায়। সেই বিষাক্ত আবহাওয়াকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী।

প্রায় দশ বৎসর কাল এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নানা ভাবে নানা কাজে মাসুদ সাহেবের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তাঁর গৃহিণীও নিয়মিত আসতেন। বহু সভাসমিতি করা হয়েছিল তখন। দাঙ্গায় উপদ্রুত অঞ্চলে সম্প্রীতি শিবির করা হত—ছোটো বড়ো দাঙ্গা তো লেগেই থাকে দেশ জুড়ে। পারস্পরিক মেলামেশার জন্য ঈদ বিজয়া উৎসবেও সোৎসাহে যোগ দিতেন তখন এই ব্যস্ত আইনজীবী এবং পরবর্তী কালের বিচারপতি মাসুদ। আমাদের এই বাড়ির

ছাতেও সেইরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন আমার ভাসুর ড. গণি, যিনি কমিউনিস্ট পার্টির একজন শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন। সম্প্রীতি পরিষদের টাকা-কড়ি বিশেষ ছিল না ঠিকই, তবু এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানেরও তিনি ট্রেজারার ছিলেন—যেকালে বিশ্বভারতীর ট্রেজারার হিসাবে তাঁর কাঁধে দায়িত্বের ভার কিছু কম ছিল না। অবশ্য বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ যোগ ছিল চিত্তের। অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য পদের ভার তিনি শেষ দিন পর্যন্ত বহন করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু মনে হত যে বিশ্ব-ভারতীর কাজ তাঁর যত প্রিয় ছিল ততখানি আর কিছু নয়।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে আমি তাঁর সঙ্গে পৌষ-মেলায় গিয়েছিলাম। সেবার সমাবর্তনে আবু সয়ীদ আইয়ুবকে দেশিকোত্তম উপাধি দান করার প্রস্তাব হয়েছিল। তিনি শয্যাগত ছিলেন বলে তাঁর প্রতি-নিধিত্ব করার জন্য আমাকেই যেতে হয়েছিল। আমিও আর্থরাইটিসে পঙ্গু বলে ট্রেনে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তাই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। মাসুদ সাহেবও সকন্যক সেই গাড়িতেই যান। দৌহিত্রও সঙ্গী হয়েছিল। সারা পথ খুব আনন্দে গিয়েছিলাম আমরা।

সমাবর্তন হয়ে যাবার পরেও মাসুদ সাহেবের মোটেই ফিরতে ইচ্ছা করছিল না। নাতিকে নিয়ে সারা শান্তিনিকেতনে আর মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ছিন্ন-বাধা পলাতক বালকের মতো। শেষকালে ৯ই পৌষে প্রয়াত আশ্রমবন্ধুদের স্মরণে হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর তাঁকে বহুকষ্টে ফিরতে রাজি করা গেল। কিন্তু আনা কি যায়! প্রাক্তনীরা তখন পাঠভবনের রান্না-বাড়ির প্রাঙ্গণে সোৎসাহে নৃত্যগীত অভিনয় শুরু করে দিয়েছেন। তার আকর্ষণ কাটিয়ে আসা মাসুদ সাহেবের পক্ষে বড়োই কঠিন ছিল। তিনি তখন গলা ছেড়ে প্রাণের আনন্দে গানে যোগ দিতে চাইছিলেন। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে অত্যন্ত অনিচ্ছায় ফিরে

এসেছিলেন সেদিন। আরও একটা দিন না থাকতে পেরে বেশ মনঃক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো একজন অসুস্থ মানুষকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সীমান্তে এবং কলকাতায় আমরা কিছু ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজ করেছিলাম একসঙ্গে। মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে যেমন মাসুদ সাহেবের বাড়িতেও তেমনি বহু বুদ্ধিজীবী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার উপর আবার মাসুদ সাহেবের আত্মীয়রাও কেউ-কেউ এসে পড়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের কাজেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল।

তথাকথিত জয়বাংলা থেকে ছিটকে এসে পড়া অনাথ ছিন্নমূল শিশুদের জন্য কল্যাণীতে একটি আশ্রম গড়ে তোলেন মৈত্রেয়ীদি। কেন্দ্রীয় সরকারের উদার সহযোগিতা পেয়েছিলেন তখন। এই আশ্রমেরই নাম দেন খেলাঘর। প্রথমটায় ওই খেলাঘরের সঙ্গে মাসুদ সাহেবেরও যোগ ছিল। বৎসর শেষ হবার আগেই পূর্ব পাকিস্তান নব নাম নব রূপ নিয়ে যখন বাংলাদেশ হয়ে জন্ম নিল, তখন কল্যাণীর খেলাঘর থেকে সেই দেশের শিশুদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ এল। তখন বুঝতে পারলাম ওদের উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই, আমরা ভিন্ন দেশের নাগরিক। অথচ ওদের নিয়ে এই কাজটায় আমরা এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে কাজটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছিল না।

তাই নব পর্যায়ে খেলাঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মধ্যমগ্রামের কাছে বাদু গ্রামে। শুধু দুস্থ আতুরদের সেবা করার উদ্দেশ্যে নয়। একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যে অসাম্প্রদায়িক কিছু মানুষ গড়ে তুলবার উচ্চাশা নিয়েই এই খেলা-ঘরের কাজে আমরা কেউ-কেউ মেতে উঠেছিলাম

মৈত্রেয়ী দেবী এবং তাঁর স্বামী ড. মনমোহন সেনের সঙ্গে। আমরা ভাবছিলাম এই শিশুগুলি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে পারিবারিক কুসংস্কার ও বিদ্বেষের উত্তরাধিকার থেকেও মুক্ত থাকবে। তাই গোড়া থেকেই একটা সদর্থক ধর্মনিরপেক্ষ আবহাওয়ায় মানুষ করতে পারলে এই ভিন্ন জাতি-ধর্মের গৃহহারা শিশুগুলির মনে নতুন ভারতের যথার্থ ভিত্তিস্থাপন করা সহজ হবে।

কিন্তু মাসুদ সাহেবের মনে হচ্ছিল যে এর ফলে সম্প্রীতি পরিষদের কর্মক্ষেত্র অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তিনি তাই এতে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। খেলাঘরে দুই একবার গিয়ে তাঁর ভালো লেগে-ছিল ঠিকই, তবু তাঁর মনে হয়েছিল যে এটা একটা এতিমখানা মাত্র। এই কাজেই সবটুকু মন দিয়ে ভারতজোড়া সম্প্রীতি প্রসারের যে বৃহৎ ভূমিকা ছিল সম্প্রীতি পরিষদের সেটিকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। কিন্তু এটা যে একটা বৃহত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে, এই অনাথ আশ্রমে মৈত্রেয়ীদি যে শান্তিনিকেতনের আদলে একটি পরিচ্ছন্ন বৌদ্ধিক-নান্দনিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন সেটা তাঁর ঠিকমতন চোখে পড়ে নি। তাই এই কাজেই সম্প্রীতি পরিষদ সর্বশক্তি নিয়োগ করায় মাসুদ সাহেব একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

এর পর থেকে স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সঙ্গে মাসুদ সাহেবের সম্পর্ক শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে পরিষদের পূর্বতন কর্মকাণ্ডও গুটিয়ে আনা হয়। মৈত্রেয়ীদির অবশ্য মনে হচ্ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ'-এ পরিণত হওয়ায় ভারতীয় মনোভাব পালটাবে এবং সম্প্রীতিপ্রচারের প্রয়োজন আর তত থাকবে না। তাঁর আশাবাদের ভিত্তি যে কত দুর্বল ছিল তার প্রমাণ তিনি ভূরি-ভূরি পেয়ে গিয়েছেন এবং আরও যে পেতে হল না এর জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই। কারণ ১৯৯০ সালের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে মৃত্যুর অল্প কয়েক মাস আগে মৈত্রেয়ীদি তাঁর তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির পাট আনুষ্ঠানিকভাবেই তুলে দিয়েছিলেন।

খেলাঘরের কাজের সঙ্গে মাসুদ সাহেব যুক্ত না থাকলেও তাঁর সঙ্গে আমার যোগ নানাভাবেই ছিল। বরং বলা যায় মাসুদ সাহেব আরও যত অসংখ্য কাজ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারই দু-চারটির সঙ্গে আমারও যোগ হয়েছিল। আসাম থেকে বাঙালি উৎসাদনই হোক অথবা পশ্চিমবাঙলার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সহজপাঠ উৎসাদন, কিংবা শাহবানুর সমর্থনে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন—নানা বিচিত্র ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যোগ অব্যাহত ছিল শেষ পর্যন্ত।

বছর পাঁচ-ছয় আগে ছোটো আকারে একটি বড়ো কাজ হাতে নিয়েছিলেন। W.B.C.S. পরীক্ষা দিতে আগ্রহী যেসব ছেলেমেয়ে ভালো স্কুল-কলেজে পড়বার সুযোগ পায় নি বলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে ভয় পায় তাদেরই জন্য বিনা বেতনে একটি কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। মফসলের মুসলিম ছেলেরাই এতে বেশি আসত···মুসলিম মেয়ে এই কয় বৎসরে একজনও আসে নি। হিন্দু ছেলেমেয়েও এসেছে মাঝে-মাঝে। দিবারাত্র তাঁর কাজের তো বিরাম ছিল না ঘরে এবং বাইরে। তারই মধ্যে নিজের চেম্বারে বসেই ক্লাস নিতেন, দু-তিনটি পেপার একা তিনিই পড়াতেন। আমাকেও ক্লাস নিতে বলায় আমি ইংরিজি ক্লাস নিতে শুরু করি। শুধু শর্ত করেছিলাম যে ছাত্রদের আমার ঘরে এসে পড়তে হবে। সপ্তাহে একটি দিন মাত্র। কিন্তু এই কাজে আমি আনন্দ পেয়েছি, তার জন্য মাসুদ সাহেবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অথচ উনিই আমাকে এমন করে ধন্যবাদ জানাতেন যেন আমি তাঁর কোনো ব্যক্তিগত উপকার করেছিলাম। এই ক্লাস করার ফলেই সমাজের যে অংশের ছেলেদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম তা

আগে কখনও পাই নি। এই যোগাযোগকে আমি আমার জীবনের এক মূল্যবান অর্জন বলে মনে করি। জানি না মাসুদ সাহেবের আরব্ধ এই কাজ এর পরেও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা।

এই শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে মাসুদ সাহেবের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দেশবিভাগের পরে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পশ্চিমবাঙলার শিক্ষিত সংস্কৃতিমান মুসলমান যাঁরা সাহস করে দেশত্যাগ করেন নি তাঁদের সংখ্যা গুনবার জন্য এক হাতের সবকটি আঙুলেরও দরকার হত না। অগত্যা সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই সংখ্যালঘু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মাসুদ সাহেব, অধ্যাপক মাহমুদ এবং কাজি আবদুল ওদুদকেই যেতে হত। ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কারণে আইয়ুব বইখাতা ছেড়ে ঘরের বাইরে বিশেষ যেতেন না। তাঁর অগ্রজ ড. আবু আসাদ গণি প্রধানত রাজনীতি এবং সমাজসেবা নিয়েই জড়িয়েছিলেন। আর ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। পূর্ব পাকিস্তানে চাকুরিরতা তাঁর স্ত্রী এবং নাবালক পুত্রদুটিকে এদেশে নিয়ে আসা তখন সম্ভব ছিল না তাঁর লেখনীর উপর নির্ভর করে। অন্য চাকুরি ধরে রাখা তাঁর স্বভাবে ছিল না। আবার পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করতে তাঁর মন একান্ত নারাজ ছিল। ফলে দুই শত্রু দেশের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত পরিবারকে নিয়ে তিনি নিয়ত অস্বস্তির মধ্যে কাটাতেন।

এঁদের মধ্যে মাসুদ সাহেবেরই দৃঢ় শিকড় ছিল এই রাজ্যের মাটিতে। তারই জোরে নিজের সমাজের মধ্যে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থেকেও মাথা তুলে রাখতে পেরেছিলেন সব সমাজের উর্ধ্বে। সৈয়দ মুজতবা আলি আদতে সিলেটের মানুষ ছিলেন, কাজি আবদুল ওদুদ যতদূর জানি ঢাকার এবং অধ্যাপক আবুল ওয়াহাব মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার। আর আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং তাঁর অগ্রজ তো মূলে ছিলেন ওয়েলেসলি স্কোয়ারের উর্দুভাষী সমাজের।

কিন্তু সাদত আবুল মাসুদের দেশ ছিল হাওড়া জেলার বাগনান গ্রামে—তাঁদের অঞ্চলের মানুষের মুখে যেন শুনেছি 'বাইনান' গ্রাম। সেখানকার মাটিতেই এখন তিনি চিরবিশ্রাম পেয়েছেন। কিন্তু সারা জীবনেই শান্তির জন্য বার-বার ছুটে গিয়েছেন তাঁর এই অখ্যাত গ্রামে—অথচ তিনি অত্যন্ত সদর্থেই একজন নাগরিক মানুষ ছিলেন। জেনেভায় হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের কাজেই থাকুন অথবা ফিনান্স কমিশনের দায়িত্ব পালন করুন শ্রীনগরে কিংবা চীন আর রাশিয়ায় ঘুরে বেড়ান, শেষ পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন এই বিলেতফেরতা ব্যারিস্টার মশাই তাঁর বাগনানের বাড়িটিতে ফিরে গিয়ে। সেখানকার আমজামের বাগিচায়, পুকুরঘাটে—যেখানে তাঁর সাত পুরুষের ভিটে। যখনই দু-চার দিন ছুটি পেতেন একাই চলে যেতেন সেখানে। সেই বাড়ি যাতে পোড়ো বাড়ি না হয়ে যায় তাই নিয়মিত তার সংস্কার করাতেন। মাঝে-মাঝে এসে গল্প করতেন, পুকুরে সাঁতার কেটে, গ্রামের মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে কেমন শরীর মন ভালো হয়ে যায় তাঁর। যে ঘরে তাঁর পিতা-পিতামহ থেকেছেন সেই ঘরে তাঁদেরই সংগৃহীত বইপত্র নাড়াচাড়া করে অবসর কাটাতেন। গ্রামের পাড়াপড়শির ঘরে-ঘরে ঘুরে তাঁদের দুঃখসুখের খোঁজখবর নিতেন—তাঁদের সুখদুঃখের অংশী হতেন। গ্রামের মসজিদের আজান শুনে উঠে ফজরের নামাজ পড়তেন।

হাঁ, এই তাঁর আর-একটা দিক যা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করার যোগ্য। আমি তাঁর মতো ধার্মিক অথচ "ধর্ম-নিরপেক্ষ" লোক এত কাছ থেকে বিশেষ আর কাউকে দেখি নি। তাই আগ্রহের সঙ্গে তাঁর মানসিক গঠন বুঝবার চেষ্টা করেছি। অধ্যাপক মাহমুদ ধর্মাচরণ সম্বন্ধে উদাসীন, আইয়ুবও তাই ছিলেন। তাঁরা যে-কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করেন না, সে কথা স্বীকার করার ফলে মাঝে-মাঝে স্বসমাজের নিন্দাভাজন হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু মাসুদ সাহেব নিয়মিত নামাজ-রোজা পালন করতেন। ভোরবেলা উঠে কোরান শরীফ পাঠ করলে তিনি মনের আশ্রয় পান একথা নিজেই বলতেন। এ বিষয়ে তিনিও অকপট ছিলেন। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একাত্ম হবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে তাঁর নাস্তিক ভাবরূপ ঘোষণা করতে কখনও শুনি নি। এর ফলে বৃহত্তর সমাজে তাঁকে অপাংক্তেয় হতেও তো দেখি নি। আবার শুধু কওম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কায়, অবিশ্বাসী হয়েও, ঈদের জামাতে শামিল হতে হয় নি তাঁকে। তাঁর বিশ্বাস এবং আচরণ বিষয়ে তিনি অকপট ছিলেন বলেই তিনি দুই সমাজের শ্রদ্ধা ও আস্থার পাত্র ছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গেও তাঁর যে আমরণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাও অনেকে জানতেন না। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে, আবার ঈদের জামাতেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন।

নানা সময়ে ইসলাম বিষয়ে, বিশেষ করে ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। মুসলমানদের ধর্মবিষয়ে যুক্তিহীন গোঁড়ামি ও অনুদারতার প্রসঙ্গে অমুসলমানের মনে যে বিরূপতা, তার জন্য প্রায়ই তিনি স্বসমাজকে দায়ী করতেন। কোরান হাদীস যত্ন করে বুদ্ধির সঙ্গে অনুধাবন করলে যে সংকীর্ণতা দূর হবেই—এ বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল না। আমাকে হাদীসের একটি বাঙলা অনুবাদ দিয়েছিলেন পড়ে দেখবার জন্য।

বাংলাদেশ থেকে ভোরবেলায় "পথ ও পাথেয়" নামে যে অনুষ্ঠানটি বেতারে প্রচারিত হয় সেটি তিনি নিজে নাকি নিয়মিত শুনতেন, আমাকেও শুনতে বলেছিলেন। আমি মাঝে-মাঝে শুনেছি এবং শুনি। তবে কেবলই মনে হতে থাকে যে তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ক'জন নাগরিক এই বেতার আলোচনা থেকে 'পাথেয়' সংগ্রহ করে থাকেন তাঁদের নিত্য দিনের জীবনযাত্রায়। অবশ্য এই প্রশ্ন সব সমাজের সব ধর্মের প্রচারণা বিষয়েই করা যায়।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও কেউ-কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছেন, মাসুদ সাহেব তো মুসলিম পার্সোনাল ল পালটে সব ভারতীয়দের জন্য (এখনই) এক আইন করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহলে তাঁকে সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় কি? ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে এই দেশের সব হিন্দুসন্তানই যেহেতু সব সম্প্রদায়ের জন্য একই ব্যক্তিগত আইন চান, অতএব তাঁরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক—তা ছাড়া জন্মসূত্রেই দেশপ্রেমিক তো বটেনই। কোন্ মুসলমান নাগরিক খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ তার বিচার করার কষ্টিপাথর হল, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন। যদি একীকরণের সপক্ষে হন কেউ তাহলেই তিনি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক ভারতীয় নাগরিক, নয় তো নয়।

স্পষ্ট করে বলা বাহুল্য নয় যে, আমি এই মানদণ্ড স্বীকার করি না। বরং উলটো দিকে অনুভব করি যে অসংখ্য হিন্দু সন্তান আছেন যাঁরা এই 'পার্সোনাল ল'-টাকে 'ইশু্য' করে রেখেছেন অত্যন্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে। তা ছাড়া তাঁরা জানেনও না যে এমনকী ইসলামী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও হিন্দুর ব্যক্তিগত আইনে হাত দেওয়া হয় নি এবং যে-কোনো হিন্দু পুরুষ ইচ্ছা করলেই আইনত একশটি অথবা তারও বেশি বিবাহ করতে পারেন (করেন কি), হিন্দুনারী স্বামিগৃহে যতই নির্যাতিতা হন না কেন, বিবাহবিচ্ছেদ এবং খোরপোশ লাভ করা প্রায় অসাধ্য, আর সে দেশের হিন্দু কন্যারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী নন। তবু সেই দেশের এক কোটি কুড়ি লক্ষ হিন্দু নাগরিকদের দেশপ্রেমের প্রমাণ দেওয়াবার জন্য একই ব্যক্তিগত আইনের আওতায় আনবার কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলেছেন বলে শুনি নি। ঘাড় ধরে তাদের সমাজসংস্কার বা উন্নতি করবার জন্য কেউ বদ্ধপরিকর হন নি।

মুসলিম পার্সোনাল ল-তে যে কারণে নেহরু হাত দিতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন মোটামুটি সেইসব কারণেই মাসুদ সাহেবও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

মুসলমানরা যেন মনে না করেন যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে তাঁদের উপর এই জবরদস্তি করছেন। শিক্ষাদীক্ষা এবং আধুনিক চিন্তার প্রসার হলে সংখ্যালঘু সমাজ থেকেই যখন পরিবর্তনের দাবি উঠবে তখনই পরিবর্তন করা সঙ্গত হবে। পরিবর্তন উপর থেকে চাপিয়ে দিলে শুভ হয় না—তাদের নিরাপত্তাবোধ আহত হয়···ইত্যাদি।

অন্য পক্ষে আমার প্রশ্ন, সংবিধানে যত মহৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার কতটুকু পালন করা বাস্তবে সম্ভব হয়েছে? সংবিধানে সমঅধিকারের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও এদেশের নারী, এদেশের অন্ত্যজরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন সুবিচার অথবা সমঅধিকার লাভ করছেন না, তেমনি মুসলমানরাও অনেক সময় পাচ্ছেন না—একথা আজ এদেশে বলা কত বিপজ্জনক তা জেনেও বলছি। অন্যদের কথা আপাতত বাদ দিয়ে, নাঃ বাদই বা দেব কেন! কথাটা যখন উঠেছে তখন এই প্রশ্নও করি যে, আজ যখন মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে তখন কেন এমন দেখতে পাই যে এই সুপারিশকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবার জন্য আমি আমার উচ্চবর্ণের শত-শত বন্ধুদের মধ্যে ৬ জনকেও পাশে পাই না? একি সম্পূর্ণতই শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে 'মেধা' এবং 'মান'-এর সমর্থনে নৈর্ব্যক্তিক মত-দান? মনের কোনো কোণেও কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা লুকানো নেই কারুর? অথবা সেই সনাতন প্রার্থনা: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'

আরো শতকরা ২৭% অনুন্নত মানুষকে সমান সুযোগ দেবার প্রস্তাবটুকু করা মাত্র সর্বক্ষেত্রের মান রসাতলে যাবে—এই আশঙ্কায় দেশের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যাঁরা পরম দুর্ভাবিত তাঁদের একবার তামিলনাড়ুর দিকে তাকিয়ে দেখতে বলি। হাজার-হাজার বৎসর ধরে অন্ত্যজদের প্রতি ব্রাহ্মণের অত্যাচার যেমন নিন্দনীয় ছিল, আজ ওই রাজ্যের সর্বক্ষেত্র থেকে ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ উৎসাদন ঠিক ততখানি না হলেও নিন্দনীয় তো বটেই। কিন্তু উচ্চবর্ণের মেধা থেকে বঞ্চিত হয়ে তামিলনাড়ুর মান কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে অন্য সব রাজ্য থেকে পিছিয়ে পড়েছে সেটা তুলনা করে দেখা যাক না? অন্তত চিকিৎসার মান এবং চিকিৎসকের সততা তো সারা ভারত জুড়ে খ্যাতিলাভ করেছে!

গণতান্ত্রিক দেশে যে-কোনো অংশের কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগলে বিতর্কের ঝড় উঠবেই—ওঠায় ক্ষতি নেই, যতক্ষণ না সেটা রক্তক্ষয়ী হিংসায় পরিণত হচ্ছে। সুবিধা যাঁরা ভোগ করছেন তাঁরা বিনাবাক্যে সব সুযোগসুবিধা ভাগ করে নেবেন 'বহিরাগত' অংশের সঙ্গে এটা প্রত্যাশা করা যায় না। ফলে উচ্চবর্ণের এই অসহিষ্ণু প্রশ্ন: আর কতকাল এই নিম্নবর্ণের অপদার্থদের বিশেষ সুযোগ দিতে হবে? মুসলমানদের তোয়াজ করতে হবে? এর জবাব তো স্পষ্ট। যতদিন না দেখা যাচ্ছে যে দেশের সব দুর্বল শ্রেণীর মানুষই অবাধ আর ন্যায্য প্রতিযোগিতায় নিজের-নিজের সংখ্যানুপাতে যথেষ্ট সংখ্যায় এসে সব পদ অধিকার করতে পারছেন। না যদি পারেন তাহলেই বোঝা যাবে যে শিক্ষাব্যবস্থায় বা সমাজব্যবস্থায় কোনো বিষম (বি-সম) বাধা আছে। তখন কেবলমাত্র সংবিধানীকৃত সম-অধিকার আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তুলে সেই অসম বাধাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

আর যতক্ষণ না অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে অসম ব্যবস্থার আমরা সমাধান করছি ততক্ষণ ব্যক্তিগত আইনের একীকরণের উপর চাপ দেওয়াটা একটা বাড়তি উৎপাত। সংখ্যালঘুরা তাঁদের ব্যক্তিগত আইন আঁকড়ে ধরে থাকলে সারাদেশের এমন কিছু ক্ষতি হয় না, যার জন্য এটাকেই উপলক্ষ করে সাম্প্রদায়িক বিরোধে উশকানি দেওয়া চলে। তার চেয়ে অনেক গুরুতর সমস্যার সমাধানে আমরা আজও হাত দিই নি। আর ব্যক্তিগত আইনের একীকরণ না হলে দেশের যত না ক্ষতি তার চেয়েও মুসলমানের নিজেদেরই ক্ষতি

অনেক বেশি—একথা মনে রাখলে এতখানি অধীর হবেন না যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ।

সাংবিধানিক আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমকে যখন থেকে এদেশে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন থেকেই একটা নূতন পরীক্ষা শুরু হয়েছে এই দেশে। গান্ধীজী নিজেই যখন সর্ব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে গ্রহণ করেছেন, তখন বোঝা যায় আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মেজাজের সঙ্গে এটাই খাপ যায়—এই আদর্শকে গ্রহণ করার চেষ্টাই বোধহয় আমাদের স্বভাবসঙ্গত হবে। পশ্চিমী সেকুলারিজমের ধারণাকে এদেশের মনের জমিতে রোপণ করার চেষ্টা সার্থক হবে না, হয়তো বা প্রয়োজনও নেই। কিন্তু সর্বধর্মের প্রতি সমভাবের চর্চাও যে সহজসাধ্য হবে না তা প্রতিদিনই বুঝতে পারছি পজিটিভ সেকুলারিজমের দৌরাত্ম্য দেখে। যাই হোক, মাসুদ সাহেবকে আমি এই অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ বলতে চেয়েছি এবং শ্রদ্ধা করেছি—যদিও ব্যক্তিগত রুচিতে আমি সব ধর্মের প্রতিই সমান উদাসীন।

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে সদ্য-প্রয়াত বন্ধুকে স্মরণ করতে বসে উপরোক্ত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কী? প্রথমত প্রাসঙ্গিকতা এই যে, এজাতীয় ভাবনা-চিন্তাই আমরা আদান-প্রদান করেছি বহুদিন যাবৎ। আরও একটি প্রাসঙ্গিকতাও আছে বটে: ভারতীয় মুসলমানকে আজ জীবনে মরণে প্রমাণ দিতে হচ্ছে, এই দেশের উপর তার আত্মিক অধিকার কতটুকু। বন্ধুকৃত্য হিসাবে সেই প্রমাণ অল্প একটু পেশ করলাম।

তবে এইসব ছাপিয়ে মনে পড়ছে একটি সন্ধ্যা। শিমলার অ্যাড্‌ভান্সড স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে ১৯৮৬ সালে পাঁচ-দিনব্যাপী সেমিনার চলছিল, বিষয়: রবীন্দ্রনাথ। মাসুদ সাহেব তো ছিলেনই—তিনি তখন ওই প্রতিষ্ঠানের ভাইস-চেয়ারম্যান। সারা-দিনব্যাপী আলোচনার শেষে সন্ধ্যায় একদিন বিনোদনের আসর বসেছিল। নানা-জনে নানা-রকম গাইছেন, নাচছেন। মাসুদ সাহেব পকেট থেকে ছোট্ট একটা ডায়েরি বার করে শব্দগুলি দেখে নিয়ে গেয়েছিলেন,

'বিশ্বসাথে যোগে যেথা বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

তাঁর কণ্ঠে যত গান ছিল তার চেয়ে প্রাণে গান ছিল আরো অনেক বেশি। সেটা সবাইকে স্পর্শ করেছিল।

দর্শনের ছাত্র হলেও বিশ্বের সঙ্গে মাসুদ সাহেবের যোগ তাত্ত্বিক ছিল না, ছিল হার্দিক।

বাঙলার বাউল নিয়ে বাণিজ্যিক বই

সুধীর চক্রবর্তী

চার পৃষ্ঠার ইনডেকস সমেত একশো বারো পৃষ্ঠার চটি বইটি সম্পর্কে এক কথায় বলা চলে: 'more commercial than melodious and devotional'। কথা কটি লেখক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেন হালফিলের বাউল গান সম্পর্কে। বাণিজ্যিক বই এতে সন্দেহ নেই, নইলে নিতান্ত মামুলি ছাপা-বাঁধাইয়ের এই চটি বইয়ের দাম কেন হবে নব্বই টাকা? তবু তাই নাহয় হল, যদি বুঝি নব্বই টাকায় পাঠক পাবেন বেশ কিছু নতুন তথ্য বা বিশ্লেষণ। না, তা-ও নেই। তবে হ্যাঁ, বইয়ের ভাষা ইংরাজি, তাই বিদেশে কাটতি হবে। কিন্তু সেটাও দুশ্চিন্তার বিষয়, কেননা এমন একখানা সাদামাটা বই বিদেশীরা যদি পড়েন তবে বাঙলার বাউলগান সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা বা প্রসন্নতা গড়ে উঠবে না।

"বাউলস অব বেঙ্গল" বইয়ের লেখক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আগে পড়ি নি। বইয়ের জ্যাকেটে লেখা আছে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মডার্ন ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস' বিষয়ে এম. এ। সেটা কী বস্তু? ১৯৮০ সালে তিনি পেয়েছেন 'অনারারি ডি. লিট'। কোথা থেকে? বাউলগানের মতোই দুর্বোধ্য বা দ্ব্যর্থক এইসব ইঙ্গিত মনে রেখে বইটা আগাগোড়া পড়ে বোঝা গেল লেখক সস্তায় বাজিমাত করতে চেয়েছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতো তাত্ত্বিক তিনি নন, মনসুরউদ্দিনের মতো সংগ্রাহক তিনি নন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতো ভ্রমণশীল পরিশ্রমী নন। সর্বাধুনিক কালের আগে বাউল বিষয়ে এঁরাই তো সর্বমান্য এবং সেইসঙ্গে ক্ষিতিমোহন। এঁদেরও পরে গত এক দশকে বাউলতত্ত্ব ও গৌণধর্ম নিয়ে দুই বাঙলায় এত কাজ হয়েছে, এত বই বেরিয়েছে যে এখানে তার নাম উল্লেখ করতেই অনেক জায়গা লাগবে। তবে প্রণববাবু সেসব কাজ বা বই সম্পর্কে যে সচেতন বা সতর্ক তার কোনো পরিচয় তাঁর বইতে পাই নি, একথা উল্লেখযোগ্য।

এবারে বইটির একটি মোটামুটি পরিচয় দেব। মোট পাঁচ অধ্যায়ে বইয়ের বিষয়বস্তু বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায় *The Bauls* (মোট ১১ পৃষ্ঠা), তারপরে *The Baul cult* (৮ পৃষ্ঠা), তারপরের অধ্যায় *Sadhana* (২৫ পৃষ্ঠা)। এরপরে আছে বাউল গান বিষয়ে ৫৫ পৃষ্ঠার আলোচনা, যার ভিত্তি অনেকগুলি বাউলগানের অনুবাদ। সবশেষে আছে ৯ পৃষ্ঠার *Observations*, যাতে বাউল আর বাউলগানের বিবর্তন বোঝানো হয়েছে এবং এমনকী কলকাতার পাতাল রেল সম্পর্কে একটি বাউলগান (?) তুলে লেখক বাউলগানের সর্বাধুনিক বিকৃতির পরিচয় দেখিয়েছেন। বইটির প্রধান সম্পদ হল চতুর্থ অধ্যায়ে সহজ ভাবানুবাদে অনেক বাউলগানের নমুনা। বিদেশীদের পক্ষে বা বাঙলা না-জানা পাঠকের পক্ষে সেটা একটা বড়ো লাভ বিশেষত এইজন্য যে, লেখক লালন সাহের প্রচুর গানের অনুবাদ দিয়েছেন! লালন চর্চার ধারাবাহিকতায় এই অনুবাদ প্রয়াস এক শ্রদ্ধেয় সংযোজন। অবশ্য আমাদের মনে পড়ে যায় ঢাকা বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত আবু রুশদের অনূদিত *Songs of Lalon Shah* বইটির কথা। লালনগীতির ব্যাপক অনুবাদ প্রসঙ্গে ওই বইটি পথিকৃৎ।

বইটিতে প্রণববাবু যেসব কথা বলতে চেয়েছেন তার অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের মতে মিলবে না। পৃষ্ঠা ২-তে তিনি যে হিন্দু বাউল ও মুসলিম বাউলের স্বতন্ত্র উল্লেখ করেছেন, তা অপ্রয়োজনীয়। বাউল বলতেই তিনি গায়ক বুঝেছেন—এটা অনভিজ্ঞতাজাত ধারণা। এমনকী উচ্ছ্বাসবশত বলেছেন: These singers are mostly devoid of any academic education, but they are gifted with poetic talent and melodious voice. সত্যি? আমি তো অসংখ্য বাউলকে জানি যাঁদের না আছে সৃজনপ্রতিভা না গানের গলা। বরং অনেক আত্মমগ্ন তাত্ত্বিক দেখেছি যাঁরা মূলত আচরণবাদী। বাউলদের মধ্যে গায়ক আর কজন? প্রণববাবু বাউলগান সম্পর্কে বলেছেন: The Baul songs can be categorized as a particular type of rural ballads of medieval Bengal। এই মন্তব্য যিনি করেছেন তাঁর গান সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত অস্বচ্ছ বোঝা যায়। বাউলগান সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক আধুনিক বিতর্ক বরং তাঁর মনেই আসে নি, সেটা হল 'বাউল সুর' প্রসঙ্গ। এখন তো অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন বাউল সুর ব্যাপারটি আসলে কী রকম? দক্ষিণবঙ্গে উত্তরবঙ্গে মধ্যবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে বাউল গানের সুরের ধরন ও চলন তো একরকম নয়। কোনোটায় ঝুমুরের চাল, কোনোটায় কীর্তনের, কোনোটায় আবার কিছু ভাটিয়ালি। সত্যিকারের বাউলসুর বলে বোধহয় কিছু নেই।

বাউলদের সম্পর্কে লেখকের কাছে আরো কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাদের, অর্থাৎ আধুনিক পাঠকদের। যেমন বাউলদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তাঁদের বাউলজীবন গ্রহণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ, তাঁদের প্রতিবাদী ভাবনার স্বরূপ, তাঁদের চারিচন্দ্র বা ছিচন্দ্র সাধনের শারীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (বাংলাদেশের 'গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক কাজ দেখেছি), তাঁদের প্রতি মৌলবাদীদের প্রতিরোধ ইত্যাদি। প্রণববাবু এসবের ধারেকাছে যান না। বরং সেই বস্তাপচা উলটাসাধন, ভাণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ, বোধিচিত্ত, মনের মানুষ আর গুরুবাদ নিয়ে পৃষ্ঠা ভরান। এসব কথা তো আমরা শশিভূষণ, ক্ষিতিমোহনদের আমল থেকে শুনছি। আমাদের নতুন কথা জানতে ইচ্ছা হয়।

হ্যাঁ, নতুন কথাও আছে। যেমন পৃষ্ঠা ৪-এ লেখকের বক্তব্য: The biggest concentrations of this tribe are to be found in the districts of Birbhum, Burdwan, Nadia and 24 Parganas. নতুন কথা বটে। মুর্শিদাবাদ আর উত্তরবঙ্গ বেবাক বাদ? বইটির নাম তো Bauls of West Bengal নয়, তবে কেন কুষ্টিয়া যশোহর বা সারা পূর্ববঙ্গ বাদ? প্রণববাবুর একটি সবদিক-সামলানো সিদ্ধান্ত এই-রকম যে, The growth of Baul movement became closely associated with Hinduism and rather the Vaishnava philosophy, with a superficial coating of Sufi-ism here and there। কত সহজে সমাধান হল। তবে বাউল আন্দোলনে গভীর অন্তঃশীল সুফিবাদকে superficial coating বলা বেশ অভিনব নয় কি?

বইটির নানা জায়গায় লেখকের সংশয় আমাদের বিপন্ন করে। যেমন লালনশিষ্য দুদ্দু শাহ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: It is not known if Duddu was a Hindu or a Muslim; অন্যত্র পাঞ্জু-শাহ সম্পর্কে perhaps a Muslim by birth। এসব অজ্ঞতা আর সংশয় কেন? দুজনেরই জীবনতথ্য তো বহুল পরিজ্ঞাত। দুজনেই মুসলমান। দেখা

Bauls of Bengal—Pranab Bandyopadhyay, M.A., D. Litt. Firma KLM Private Limited. Calcutta. Rs. 90·00

যাচ্ছে, জানা তথ্য বিষয়ে তাঁর সংশয় কিন্তু অন্যদিকে সম্পূর্ণ অসত্য বিষয়ে তিনি নির্বিকারভাবে তথ্য দেন। যেমন তাঁর মতে সিরাজ সাঁই (লালনের গুরু) এক-জন বাউলপদকর্তা। কেন? যেহেতু গানের শেষের ভণিতায় 'সিরাজ সাঁই কয়' আছে তার থেকে লেখকের ধারণা হয়েছে পদটি সিরাজের এবং Siraj Sain was a capable composer। কিন্তু তাঁর অনূদিত পদগুলি তো লালনের। অনুবাদের এমন একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

Siraj Sain says, 'Oh Lalan,
You'll be lost by not knowing the self.'

দেখা যাচ্ছে, লেখক বাউলগানের ভণিতার কায়দাটাই জানেন না। তার ফলে সিরাজ সাঁই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেছেন, He can be accepted as a leading composer of Baul songs। একটাও বাউল-গান না লিখে সিরাজের এই সম্মানপ্রাপ্তি প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব স্বভাবের পরিচয় দিচ্ছে, কেননা বৈষ্ণবের লক্ষণ হল অমানীকে মান দেওয়া।

নৃত্যশিল্পের বুলবুল

কামাল হোসেন

ঢাকার বিখ্যাত "বুলবুল ললিতকলা অ্যাকাডেমি"র নাম আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যাঁর স্মৃতিতে এই সংস্কৃতিকেন্দ্রটি স্থাপিত, সেই নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী সম্পর্কে বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-বিলাসী বেশির ভাগ মানুষের অপরিসীম অজ্ঞতা নিঃসন্দেহে ক্ষমার অযোগ্য। অথচ এই কলকাতা শহরের বুকেই সেই প্রতিভাবান তরুণের স্বপ্ন এবং কল্পনার বিস্তার, যৌবনের দুরন্ত সম্ভাবনার বাস্তব পরিণতি, প্রেম ও পরিচয়। এবং শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করেছেন তিনি এই শহরের মাটিতে।

ইতিপূর্বে ১৯৬২ সালে বুলবুল চৌধুরীর ছোটো বোন সুলতানা রাহমান একটি তথ্যপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে ঢাকার বাংলা একাডেমী বইটি নতুনভাবে ছাপেন। বস্তুত, এ বইটি পড়েই প্রথম আমার বুলবুল সম্পর্কে আগ্রহ আর কৌতূহল জন্মায়। শুনেছি নীলরতন মুখোপাধ্যায় "বুলবুল-জীবনকথা" নামে একটি বই লিখেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সে বইটি আমার হাতে আসে নি। সে হিসেবে মাহমুদ নূরুল হুদার এই বইটি বুলবুল প্রসঙ্গে তৃতীয় গ্রন্থ।

বুলবুলের এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর লেখা এ বইটি একটি চমৎকার স্মৃতিকথা। একটি অসাধারণ প্রতিভা-বান মানুষকে খুব কাছে দেখার স্মৃতি স্বাভাবিক ভাবেই লেখকের আবেগ আর লেখনীকে প্রভাবিত করতে পারে, সেদিক দিয়ে শ্রীনূরুল হুদা অবশ্যই অনেকখানি সংযতবাক।

বুলবুল চৌধুরীর প্রকৃত নাম রশীদ আহমদ চৌধুরী। জন্ম ১৯১৯-এর ১ জানুয়ারি। পূর্ব বাঙলার বগুড়ায়। বাবা মোহাম্মদ আজমুল্লাহ চৌধুরী, মা মাহফুজা খাতুন। একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবেশে বুলবুলের শৈশব আর কৈশোর কেটেছে। বাড়িতে নানাধরনের বইপত্রের সংগ্রহ ছিল ভালো। কলকাতা থেকেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিয়মিত আসত। বলা যেতে পারে, বুলবুলের শিল্পীমানসের ভিত্তিভূমি ছিল তাঁর ছেলেবেলার অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ।

শ্রীনূরুল হুদার সঙ্গে বুলবুলের প্রথম পরিচয় ১৯৩৪-এ হবিবুল্লাহ বাহারের বাড়িতে। বাহার সাহেবের "বুলবুল" পত্রিকায় বুলবুল নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ লিখতেন সে সময়। পরিচয়ের পর ঘনিষ্ঠতা

অমর শিল্পী বুলবুল—মাহমুদ নূরুল হুদা। প্রকাশক: আবু রশীদ মাহমুদ, ১ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। আশি টাকা।

বৃদ্ধি পেল বেকার হোস্টেলে একসঙ্গে বাস করার সময়। তখন কলকাতা শহরে বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, টেইলার হোস্টেল, শীল ম্যানসন প্রভৃতি কেবল মুসলমান ছাত্রদের বাসস্থান ছিল না। বরং এই ছাত্রাবাসগুলি ছিল তাঁদের রাজনীতি ও শিল্প-সংস্কৃতি-চেতনার উন্মেষকেন্দ্র। বস্তুত, সে সময় বেকার হোস্টেলে বার্ষিক ভোজসভা উপলক্ষে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে বুলবুল নৃত্য পরিবেশন করেন। কলকাতায় সেটাই ছিল তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান।

কলকাতায় তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এ সময় বুলবুলের কয়েকটি গল্প "পরিচয়" পত্রিকায় প্রকাশিত হলে অনেকেই তাঁকে একজন সম্ভাবনাময় কথাসাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে ১৯৪৪-য় বুলবুল লেখেন তাঁর একমাত্র উপন্যাস "প্রাচী"। "প্রাচী"-র ভূমিকাতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন: 'প্রাচীর এই অপূর্ব আলেখ্যখানিতে বিভীষিকা আছে, বাস্তবের অকুণ্ঠিত অসুন্দর ছায়াপথ আছে। কিন্তু তার মাঝ-খানে শিল্পীর বেহালায় বেজে চলেছে অমর্ত্যলোকের অপূর্ব সঙ্গীত, শিল্পীর ধ্যানী-নেত্রে ধরা দিয়েছে অতলান্ত অন্ধকারের চক্রতীর্থে অনাগত প্রভাতের শুকতারা। ভাবীকালের সাধক আমরা—এই শুক-তারাকে বন্দনা করি।' নারায়ণবাবু তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "উপনিবেশ"-এর প্রথম খণ্ডটি বুলবুলকে উৎসর্গ করেন। ১৯৫৩-য় প্রকাশিত "পূর্ববাংলার সমকালীন সেরা গল্প" সংকলনেও বুলবুলের একটি গল্প স্থান পেয়েছিল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে বুলবুলের নৃত্য প্রতিভা সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হল। আই. পি. টি. এ-র একটি ব্যালে স্কোয়াড গঠিত হলে নৃত্যপরি-কল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পান বুলবুল। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত নৃত্যনাট্য "লেস্ট উই ফরগেট" রচনা ও পরিবেশন করেন। এই নৃত্যনাট্যটি ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের পটভূমিতে রচিত। এর আগে এদেশে কোনো একটি নৃত্যে এই বিষয়গুলি এরকম জীবন্ত, মর্মস্পর্শী হয়ে প্রকাশিত হয় নি। ১৯৪৬-এ 'শ্রী' সিনেমাহলে গণনাট্য সংঘের প্রয়োজনায় "শহীদের ডাক" শীর্ষক অনুষ্ঠানে তাঁর "কুইট ইনডিয়া" নামে নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বুলবুলের ক্রোধ এবং প্রতিবাদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই নতুন ধরনের নৃত্য-পরিকল্পনায়।

সাধনা বসুর মতো সেকালের খ্যাতনামা নৃত্য-শিল্পীও বুলবুলের সঙ্গে একত্রে অনুষ্ঠান করেছেন।

ইতিমধ্যে এম. এ. পাশ করে দমদমে টাটা এয়ারক্রাফটে চাকরিতে যোগদান করেন বুলবুল। ১৯৪৩-এ প্রতিভা মোদক নামে এক বাঙালি খ্রীষ্টান তরুণী বুলবুলের নৃত্যের দলে শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিভার সঙ্গেই বুলবুলের প্রেম ও পরিণয়। বিবাহের পর প্রতিভার নতুন নামকরণ হয় আফরোজা।

১৯৫০-এ চট্টগ্রামে কৃষি ও শিল্পের একটি প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে বুলবুল পরিবেশন করলেন তাঁর নৃত্য। এটাই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান। একই সময়ে ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহেও বুলবুলের দল নৃত্য পরিবেশন করেন। সে সময় সিলেটের পৃথ্বিমনাশায় ইরানের শাহ-এর সম্মানে একটি নৃত্য-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এ অনুষ্ঠানে 'কবি হাফিজের স্বপ্ন', 'ইরানের এক পান্থশালা', 'সোহরাব রুস্তম' প্রভৃতি নৃত্যে ইরানের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য যেন তার আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। মানুষের আনন্দ, বেদনা, সাধ আর স্বপ্ন যে ভৌগোলিক সীমারেখাকে কেমন অনায়াসে অতিক্রম করে সার্বজনীন আবেদন লাভ করে, এইসব নৃত্যে বুলবুল তার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ওই সময় তাঁর দলের ইপ্রে-

সারিও ছিলেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীনুরুল হুদা। পরবর্তীকালেও দেশে-বিদেশে বুলবুলের নৃত্য-পরিবেশনার ব্যবস্থাপক হিসেবে শ্রীহুদার ভূমিকা রীতিমতো প্রশংসাজনক।

সে বছরই পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষণশীল আবহাওয়াতেও নৃত্যের তালে-তালে এক ভিন্ন স্বাদের সাংস্কৃতিক চেতনা পৌঁছে দিলেন বুলবুল।

১৯৫৩ সালে তাঁর দলবল নিয়ে বুলবুল গেলেন ইউরোপে—ইংল্যানডে, হল্যানডে, বেলজিয়ামে, প্যারিসে। সর্বত্র প্রশংসা, অভিনন্দন, সাফল্য।

বস্তুত একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর জীবনে সাফল্য যখন প্রথম তার প্রার্থিত সুগন্ধি বয়ে আনতে শুরু করে, সেই জীবনের শুরুর প্রহরেই বুলবুলকে বিদায় নিতে হল। ইউরোপেই তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দেশে ফিরে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতে হল। ভরতি করা হল চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে। ১৯৫৪-র ১৭ মে তিনি মারা গেলেন।

নিজে কোনো সাংগঠনিক পদ্ধতি ছাড়াই নাচ শিখে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী হয়েছিলেন বুলবুল। কিন্তু শুধু নিজে শিল্পী হয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে নৃত্যচর্চার ধারা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও বুলবুল তাই তাঁর একাডেমির কথা বার-বার করে বলে গেছেন। পরবর্তী কালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত "বুলবুল ললিতকলা একাডেমী" বস্তুত এই অসামান্য প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ।

শ্রীনুরুল হুদার বইটি অত্যন্ত সুলিখিত আর তথ্যসমৃদ্ধ। বেশ কিছু দুর্লভ আলোকচিত্র ও চিঠিপত্র বইটির সম্মান বৃদ্ধি করেছে। শাসীম শিকদারের প্রচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ।

আমি শুধু অপেক্ষায় আছি, নৃত্যশিল্পী ও সাহিত্যিক বুলবুল চৌধুরীর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে কবে একটি বৃহৎ গবেষণাধর্মী গ্রন্থ লেখা হবে। এ-বাঙলায় কিংবা ও-বাঙলায়।

নারীর বোধে নারীর মন

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আরতি গঙ্গোপাধ্যায় - সম্পাদিত "নারীমনের আলোয়" ১৬টি ছোটোগল্পের সংকলন। গতানুগতিক অন্যান্য গল্পগ্রন্থের থেকে এই গ্রন্থটির একটি বিশেষত্ব আছে। ১৬টি গল্পের লেখিকা ১৬ জন মহিলা-গল্পকার এবং প্রতিটি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল নারী। সম্পাদকের সুলিখিত মুখবন্ধটি পড়ে এ ধরনের একটি গ্রন্থপ্রকাশের সঠিক কারণ সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। এ ব্যাপারে মূল উদ্যোগ নিয়েছেন—মহিলা গবেষণাকেন্দ্র। এঁদের গবেষণার মূল বিষয় নারীর 'অর্থনৈতিক জীবন এবং তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবনে তার স্বীকৃতির ক্রমবিবর্তন'। উনিশ শতক থেকেই বাঙালি সমাজে নানারকম পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেসবের প্রভাবে সমাজে নারীর স্থান আর ভূমিকাও ক্রমশ বদলে গেছে। গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হল—নারীমনে এই নিঃশব্দ পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া কী তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা।

সম্পাদক মুখবন্ধে আরও জানিয়েছেন যে, সামগ্রিকভাবে তাঁরা এই গ্রন্থের দুটি খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড। এতে আছে প্রয়াত এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লেখিকাদের রচনা। আর জীবিত এবং আধুনিক সময়ের লেখিকাদের নিয়ে প্রকাশিত হবে—দ্বিতীয় খণ্ড। নারী যখন তাঁর নিজের মনেরই বিশ্লেষণ করতে বসেন, তখন তার একটা ভিন্ন তাৎপর্য থাকে। পুরুষ নারীকে বিচার

নারীমনের আলোয়—দুই শতকের গল্পসংকলন, ১ম খণ্ড। সম্পাদনা আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, মহিলা গবেষণাকেন্দ্র। পি-২৯৫ পূর্ণদাস রোড, কলিকাতা-২৯। তিরিশ টাকা।

করেন তাঁর সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর সেই বিচারে পুরুষশাসিত সমাজের এ-যাবৎ প্রচলিত সংস্কার, গোঁড়ামি আর রক্ষণশীলতা প্রভাব ফেলতে পারে। আর তা ছাড়া নারীর মনের গভীর, গোপন অন্দরে সামাজিক নানা কারণে যে ক্ষোভ, বিষাদ বা হতাশা জমে ওঠে, তার সঠিক খবর রাখা পুরুষের পক্ষে হয়তো সম্ভবও নয়। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদককে সাধুবাদ জানানো উচিত। কেননা, প্রতিটি গল্পের বিষয় হল নারী-জীবনের কোনো-না-কোনো সমস্যা। সেসবের বিষয়ে পুরুষের হয়তো ততটা মাথাব্যথা নাও থাকতে পারে; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, নারীর ব্যক্তিগত জীবনে সেইসব সমস্যার সবিশেষ গুরুত্ব আছে।

প্রায় সব বিবাহিত মহিলার কাছেই শাশুড়ির সঙ্গে সহাবস্থান একটি বিশেষ সমস্যা। এই বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী আর নিরুপমা দেবী। দুজনের গল্পেই বউয়ের ওপর শাশুড়ির নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তবে স্বর্ণকুমারীর গল্প অতিরঞ্জনের দোষে কিছুটা দুষ্ট। শাশুড়ির নির্যাতন আর অপমান সহ্য করতে না পেরে গল্পের প্রধান চরিত্র লজ্জাবতী প্রাণ হারায়। তুলনায় নিরুপমা দেবীর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনি আত্ম-মহিমায় অনেক বেশি উজ্জ্বল। অনিও শাশুড়ির হাতে নিগৃহীত এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত। কিন্তু নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যখন শাশুড়ি আর স্বামী অনিকে ফিরিয়ে নিতে আসে, তখন আত্মসম্মানবোধে দীপ্ত সে তাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। শুধুমাত্র একটি নিটোল, করুণরসের কাহিনীর বুনন নয়। এই গল্পটিতে নিরুপমা দেবী কিছু প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন যা সংসারজীবনে একজন নারীর কাছে আজও প্রাসঙ্গিক। যেমন—'শাশুড়ী যে বৌকে দেখতে পারে না, এর কারণ কি সেই বৌই একদিন শাশুড়ির আসনের অধিকারিণী হবে বলে? কিংবা তার প্রিয়তম পুত্রের সব চেয়ে সে প্রিয় হচ্ছে বলে সেই হিংসায়?' এই গ্রন্থে অবশ্য এমন কোনো গল্প নেই যাতে আমরা এ প্রসঙ্গে শাশুড়ির মতা-মতটাও জানতে পারি।

কোনো পরিবারে পরপর কন্যাসন্তানের জন্ম আদরের না অনাদরের, এই সমস্যা নিয়ে শরৎকুমারী চৌধুরাণীর গল্প। '...গণ্ডা-গণ্ডা মেয়ে হওয়া গৃহস্থের অলক্ষণ।' কিংবা, ...'বংশরক্ষার জন্য বৌয়ের আদর, নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বই ত নয়।'—এই ধরনের মানসিকতা যে আমাদের সমাজ থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে, এটা জোর দিয়ে বোধহয় আমরা বলতে পারব না। এখনও অনেক পরিবারেই মেয়ের চেয়ে ছেলের জন্ম বেশি আনন্দের। এবং ব্যাপারটার মধ্যে কিছুটা অঙ্কের হিসাবও বোধহয় থাকে। মেয়েকে মানুষ করার পর অনিবার্যভাবে খরচ করে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হয় হেঁসেল সামলাতে। পক্ষান্তরে, ছেলে যদি ভবিষ্যতে মানুষের মতো মানুষ হয় তাহলে বাবা-মার বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার কিছুটা সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, শরৎকুমারী এই গল্পে অত্যন্ত আধুনিক। এমনকী গল্পের আঙ্গিকেও তিনি বেশ আধুনিক মননের পরিচয় রেখেছেন। গতানু-গতিক স্ট্রারেটিভ স্টাইলে গল্প বলার চেষ্টা নেই। গাঁয়ের এক পুকুরঘাটে স্নানরতা কয়েকজন রমণীর কথোপকথনের মাধ্যমে সমাজে মেয়েরা যে কতটা উপেক্ষিত, সেটিই স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছেন লেখিকা। গল্প শেষ হয় এক তীব্র বেদনাবোধের আভাসে: 'ক্রমে ঘাট শূন্য হইয়া আসিল, স্বপ্নময় মোহমুগ্ধ নয়নে আসিয়াছিলাম, সত্যের তীব্রতা লইয়া ফিরিলাম।' "রেবা" গল্পে ইন্দিরা দেবী প্রেমের তাগিদে নারীর ত্যাগ আর মহত্ত্বকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন। খ্রীশ্চান যুবতীর সঙ্গে হিন্দু যুবকের ব্যর্থ প্রেম—এই ধরনের বিষয় একসময়কার বাঙলা চলচ্চিত্রেও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। সাদামাটা স্টাইলে লেখা রাধারাণী দেবীর (গ্রন্থে সূচীপত্রে

এবং পরিচিতিতে 'দেবী' কিন্তু গল্পের টাইটেলে 'দত্ত' ছাপা হয়েছে) গল্পে আছে সমাজে প্রচলিত এক কুসংস্কারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ। নির্মল আর মাধবী পরস্পরকে ভালোবাসলেও তাদের বিবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় তুচ্ছ একটি কারণে। সেটি হল দুজনের কোষ্ঠীতে অমিল। বিবাহের আগে পাত্রপাত্রীর কোষ্ঠীবিচারের রীতি আজও আমাদের সমাজে ভালোভাবেই চালু আছে। এবং পাত্রপাত্রীর রাশিচক্রে অমিল হলে দুজনের মনের মিল হবে না, এই আশঙ্কায় অনেক ক্ষেত্রেই বিয়ে ভেঙে যায়। কাল্পনিক এক কাহিনীর মাধ্যমে অনুরূপা দেবী দেবদাসী সম্প্রদায়ের কলঙ্ক-ময় এবং নিরাপত্তাহীন জীবনের ছবি এঁকেছেন। মন্দিরের দেবদাসী চিরকালই পরাধীন, কারণ সে 'চিরদিন ধরিয়া পুরোহিতেরই সম্পত্তি।' প্রভাবতী দেবী একসময় ড্রয়িং-রুমের গল্প লিখে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সরলাবালা সরকার, প্রভাবতী দেবী, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী—এঁদের কারোর গল্পের আবেদনই আজকের পাঠকের কাছে খুব একটা বেশি অনুভূত হবে না। তুলনায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের "অবরোধবাসিনী" এবং সীতা দেবীর "স্বর্ণশৃঙ্খল" অনেক উৎকৃষ্ট মানের গল্প। হোসেনের গল্পটি কুড়িটি ছোটো-ছোটো কাহিনীর সমষ্টি। এগুলির মাধ্যমে তিনি মুসলিম আর হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি আর সংস্কারকে প্রবলভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। কৌতুকরসে উজ্জ্বল এই কাহিনীগুলির একটি এখানে উদ্ধৃত করা যাক :

> 'এক বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলংকার একটা হাত বাক্সে পুরিয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুন নিবাইতেছেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নীচে গিয়া বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য কুলকামিনীর অবরোধ।'

"স্বর্ণশৃঙ্খল" গল্পে সীতা দেবী স্বাধীনচেতা এবং প্রতিবাদী এক নারীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—যাঁর বিবাহিত জীবনে আপাতদৃষ্টিতে কোনো অভাববোধ না থাকলেও তিনি নিজে থেকেই একদিন স্বামীর সংসার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নেন। কারণ স্বামী তাঁকে পার্থিব সব স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও ব্যক্তিস্বাধীনতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। এই নারীর প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সাহস যোগায়। গল্পের শেষে স্বামীর অবহেলায় যন্ত্রণাবিদ্ধ আর-এক গৃহবধূর প্রতি এই নারীর উপদেশ : 'আলগা হয়ে দাঁড়াতে শেখো। পরগাছা হয়ে থাকলে দুঃখ কখনো ঘুচবে না।' গিরিবালা দেবীর গল্পেও আমরা আর-এক প্রতিবাদী নারীকে পাই। স্বেচ্ছাচারী ও অবিবেচক স্বামীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানায় তার নীরব উপেক্ষা দিয়ে। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা সুলেখা সান্যালের গল্পটিও ভালো লাগে। গ্রন্থের শেষ গল্পে সাবিত্রী রায় দৈনন্দিন সংসারজীবনের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট একজন লেখিকার যন্ত্রণা বেশ নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখিকাই বর্তমান প্রজন্মের পাঠকসমাজের কাছে অপরিচিত। সে ব্যাপারটা চিন্তা করেই সম্পাদক গ্রন্থের শুরুতে সমস্ত লেখিকার সংক্ষিপ্ত জীবনী আর পরিচিতি দিয়েছেন। গ্রন্থের মুদ্রণ আর বাঁধাইয়ের কাজ বেশ পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদটিও আকর্ষণীয়। নারীদের স্বাধীন আর স্বতন্ত্র ভাবচিন্তায় উজ্জ্বল এই গল্পসংকলনটি বাঙলা গদ্যসাহিত্যের প্রবহমান ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রথম খণ্ডটি পাঠ করবার পর পাঠক স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় খণ্ডটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকবেন।

মার্কসবাদী মূল্যায়নের নামে রামমোহনের চরিত্রহননই কি লেখকের উদ্দেশ্য ?

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসাবে খ্যাত শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্তীর "বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন" নামক একটি গ্রন্থ বদরুদ্দীন উমরের দৃষ্টি-আকর্ষণী ভূমিকাসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন সম্পর্কে একটি বৈশেষিক মার্কসবাদী মূল্যায়ন এতে পাওয়া যাবে।

শ্রী চক্রবর্তীর গ্রন্থটিকে সরোজ দত্তের নস্যাৎমূলক সাংস্কৃতিক দর্শন ও সত্তরের দশকের মূর্তি-ভাঙা আন্দোলনের বৌদ্ধিক উত্তরসূরি বলা যেতে পারে। উহ্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং স্বীকৃত অরবিন্দ পোদ্দারের অভিভাবকত্ব মেনে এটি রচিত। অমল ঘোষ, নরহরি কবিরাজ, মানিক মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মেরামতিমূলক আলোচনাগুলি এর পেছনে প্রতিক্রিয়া-ধর্মী উদ্দীপনী বিভাবের কাজ করেছে। মতাদর্শগত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার কারণেই হয়তো এর নস্যাৎমূলক সুরটি অনেক চড়া।

গ্রন্থটির দুটি পর্যায় বাংলার রেনেসাঁস : মূল্যায়ন ও ফলাফল (পৃ ১০-৫৬) এবং প্রসঙ্গ : রামমোহন (৫৭-৭৯)। প্রথম পর্যায়টির বক্তব্যসার হচ্ছে এই রকম—'বাংলার রেনেসাঁস' 'ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক' (৩০ পৃ) 'ইউরোপীয় মডেলের রেনেসাঁস এদেশে হয় নি, হওয়াটা বাস্তবত সম্ভবই ছিলো না। যা হয়েছিল তা ছিলো বহিরাগত ও আরোপিত ভাবসংঘাতের ফলশ্রুতিতে বহিরঙ্গের কিছু সীমাবদ্ধ আলোড়ন মাত্র, বৃটিশ বুর্জোয়াদের স্বয়ম্ভূ গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক ধ্যানধারণার শূন্যগর্ভ প্রতিধ্বনির ঐকতানমাত্র। এক কথায়, এই ছিল বহুবিজ্ঞাপিত ও বহু ঢক্কানিনাদিত বাংলার রেনেসাঁসের সারবস্তু।' (৩০ পৃ) রামমোহন পর্যায়ের বক্তব্যসার হচ্ছে এই—'রেনেসাঁসের পথিকৃৎ' রামমোহন শ্রেণীগত পরিচয়ে 'ব্যবসায়ী ও জমিদার'। 'সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি পরিচালিত হয়েছিলেন মূলত সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে' (৭৯ পৃ)। 'ঔপনিবেশিক শাসনের সচেতন সেবাদাস হিসাবে' 'তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারা ও কার্যক্রম জন্ম দিয়েছে খণ্ডিত খর্বিত ও বিকৃত এক 'আধুনিকতা'র প্রহসনের' (৭৯ পৃ)। গ্রন্থটির ভরতবাক্য মোটামুটি এইরকম : 'আধুনিক' ভারতের এই নির্মম ও দুঃসহ বাস্তবতার সূচনা-বিন্দু রেনেসাঁস এবং সূচনাপুরুষ 'রামমোহন'। রেনেসাঁসের এই ঐতিহ্য-এর 'অসহনীয় বোঝা নির্মোহভাবে ছুঁড়ে ফেলতে না পারলে সেই একই চোরাবালিতে আজও আমাদের নিমজ্জিত থাকতে হবে।'

এখন অনুসরণ করে দেখা যাক এই নাকচমূলক বক্তব্যকে লেখক কতটা প্রামাণিক ও শক্ত পোক্ত ভিত্তি দান করতে পেরেছেন।

বাঙলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গ

বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কিত প্রথম পর্যায়টিকে লেখক ৬টি সুশৃঙ্খল উপপর্যায় দিয়ে গেঁথে তুলেছেন। ১. ভূমিকা, ২. মূল্যায়নের মাপকাঠি, ৩. অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা, ৪. বাংলার রেনেসাঁস : আরোপিত ও স্ববিরোধী, ৫. সীমাবদ্ধতা, তাৎপর্য ও ফলশ্রুতি, ৬. উপসংহারের বদলে।

১. ভূমিকা

'ঔপনিবেশিক দেশে ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বিরোধিতা করাটাই কোনো আন্দোলনের বা ব্যক্তির

বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন—দীপংকর চক্রবর্তী। পিপলস্ বুক সোসাইটি, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। কুড়ি টাকা।

প্রগতিশীলতা-বিচারের মূল মাপকাঠি'—এই দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিত্তিতে প্রচলিত হয়েছিল মূর্তিভাঙা আন্দোলন। লেখকের মতে আন্দোলনটি 'পদ্ধতিগত ভাবে ভুল, প্রস্তুতিবিহীন ও শিশুসুলভ বিশ্বঅন্যার পরিচায়ক' হলেও মূল্যায়নের মাপকাঠিটি সঠিক ছিল।

২. মূল্যায়নের মাপকাঠি

মানিক মুখোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, অশোক রুদ্র, অমল ঘোষ, দিলীপ বিশ্বাস প্রমুখের বক্তব্য প্রগতিশীল ব্রিটিশ বাণিজ্যিক পুঁজির সংস্পর্শে ভারতীয় সমাজের অচলায়তন ভেঙে প্রগতিশীল নতুন সমাজ গড়ে ওঠার পথ প্রস্তুত হয়েছিল। এঁরা মার্কস-কথিত ব্রিটিশ শাসনের 'উজ্জীবনমূলক' তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেছেন। প্রতিবাদে শ্রী চক্রবর্তীর বক্তব্য মার্কস পরবর্তীকালে এশীয় সমাজে ব্রিটিশদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটির উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকবিদ্রোহের ধারাটিই ছিল প্রকৃত প্রগতিশীলতার ধারা। মানা না মানা রাজনৈতিক রুচির ব্যাপার। লেখকের বক্তব্য পরিষ্কার।

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি

বাঙলার বিত্তবান ও বণিকশ্রেণীকে ব্রিটিশ কোম্পানির উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা তাদের বাড়তি পুঁজি জমিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণে তারা ব্রিটিশদের তাঁবেদার শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। অপর দিকে লক্ষ-লক্ষ জমিহারা কৃষক ও বেকার হস্তশিল্পী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লড়াই চালিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। একদিকে ব্রিটিশানুগত জমিদার, মধ্যস্বত্ব-ভোগী শিক্ষিতবাবু, মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী—অন্যদিকে শোষিত, বঞ্চিত, কৃষক-হস্তশিল্পীর দল।

লক্ষ্য করা যায়, শ্রীচক্রবর্তী শুধু ব্রিটিশ-বিরোধিতার মানদণ্ডটির উপর জোর দিচ্ছেন, সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার পাহাড়প্রমাণ জীবনচর্যা ও সংস্কার-গুলির বিরুদ্ধে আঘাতের উপর জোর দিয়েছেন অন্য-পক্ষের প্রবক্তারা। ফলে একদল রেনেসাঁসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সামন্তব্যবস্থাভেদী বুর্জোয়া জীবন-চর্যার আলো। শ্রীচক্রবর্তী সে জায়গায় সুপ্রকাশ রায় প্রমুখদের অনুসরণে বিদ্রোহ ও গণ-অসন্তোষের মধ্যে প্রগতিশীলতার সূত্র সন্ধান করছেন।

৪. বাংলার রেনেসাঁস : আরোপিত ও স্ববিরোধী

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রত্যুষ-ফসল হিসাবে ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে পাওয়া গিয়েছিল। লেখকের মতে 'অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের বাংলার মূল অর্থ-নৈতিক ভিত্তির কোনো গুণগত পরিবর্তন হয় নি; বরং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা এদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিটিকে মূলতঃ অটুট রেখে তার উপর নিজেদের স্বার্থে কিছু রংচং ও প্রলেপ লাগিয়েছিল মাত্র। তাই ইউরোপীয় মডেলের রেনেসাঁস এদেশে হয় নি; হওয়াটা বাস্তবতঃ সম্ভবই ছিল না।' বিনয় ঘোষ (২য় সং), বরুণ দে, সুমিত সরকার, অরবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের সাক্ষ্য এখানে মানা হয়েছে।

বদরুদ্দীন উমরের অনুসরণে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে শ্রীচক্রবর্তী লিপি-বদ্ধ করেছেন। উদ্দেশ্য ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এই মডেলটি দেখে পাঠক যেন সহজেই বুঝতে পারেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে রেনেসাঁস বলা কত ভুল। ঐতিহাসিক মার্জনা করবেন—ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যে মডেলটি এখানে স্থাপন করা হয়েছে, তা কিন্তু বিভ্রান্তিকর। আসল রেনেসাঁসের সঙ্গে উল্লিখিত রেনেসাঁস-লক্ষণের সাদৃশ্য খুব বেশি নেই। প্রথমত, রেনেসাঁসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে-ছিল—এটা সর্বৈব ভুল। রেনেসাঁসের বীজমন্ত্রটির নাম 'revealation', 'reason' নয়। বিজ্ঞান জগৎ-

চিন্তার চালিকাশক্তির আসনে বসে সপ্তদশ শতাব্দীতে। ততদিনে ইতালিতে রেনেসাঁসের আলো নির্বাপিত।

দ্বিতীয়ত, রেনেসাঁস বলতে যা বোঝায় তার সবটাই লরেঞ্জোর মতো প্রিন্স, লিও ১০ম-এর মতো পোপ, চিগির মতো বণিক, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো আর্টিস্ট, স্যালুটাটি বা ব্রুনির মতো হিউ-ম্যানিস্টদের সংস্কৃতি। এঁরা সবাই উপরতলার মানুষ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সংস্কৃতির প্রায় কোনো সম্পর্ক ছিল না।

তৃতীয়ত, 'বাণিজ্যিক বুর্জোয়া শ্রেণী নিপীড়িত ভূমিদাসদের সামন্তসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল করেছিল'—এই তথ্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি কী? যতদূর জানা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের শ্রম ও স্বেদে অর্জিত মুনাফার উপরই গড়ে উঠেছিল রেনেসাঁসের জৌলুশ। জন-অসন্তোষ ও বিদ্রোহকে চাপা দেওয়া বা চূর্ণ করার সংবাদও অল্প-স্বল্প পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও জীবনস্তর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল রেনেসাঁসের সংস্কৃতি। উইল ডুরাণ্ট তাঁর রেনেসাঁস বিষয়ক মহাগ্রন্থের শেষে একথা স্বীকার করে লিখেছেন—'of course the Renaissance culture was an aristocratic superstructure raised upon the back of labouring poor; but alas, what culture has not been'. (The Story of Civilization, vol. V, page 726).

চতুর্থত, রেনেসাঁসের প্রতিনিধি বা বাহক যাঁরা ছিলেন তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কোনো প্রমাণ নেই। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও আর্টিস্টরা অধি-কাংশই ছিলেন শ্রেণীচ্যুত, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু, বিলাসী ও সুবিধাভোগী। বস্তুতপক্ষে রেনেসাঁসের কোনো সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রই ছিল না। ধর্মীয় আন্দোলন হলেও সে চরিত্র বরং রিফর্মেশনের মধ্যে অনেক বেশি ছিল। পঞ্চমত, রেনেসাঁসের জন্মভূমি নামে প্রসিদ্ধ ইতালির ইতিহাস যাঁদের জানা আছে তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন মুক্তির আলোকবার্তা-বিতরণকারী এই দেশটি রেনেসাঁসের গৌরবময় কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেই পরাধীন হয়েছিল। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন রোম বিধ্বস্ত হয় মাইকেল-অ্যাঞ্জেলো তখন St. Peter-এর স্থাপত্য নির্মাণে ব্যাপৃত। হিউম্যানিস্টরা তখন দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছেন কার্ডিনালের ভিড়ে। এক কথায়, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বা জাতীয়তাবোধের সঙ্গে রেনেসাঁসের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বাংলার রেনেসাঁসকে যদি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে মিলিয়ে নাকচ করতে হয় তাহলে আর যে প্রসঙ্গই আসুক, জন-সমৃপ্তি, সামাজিক দায়বদ্ধতা কিংবা জাতীয়তা-বোধের প্রশ্ন আসতেই পারে না। শ্রীচক্রবর্তী ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মডেল এনেছেন বলেই কিছু বাড়তি কথা বলতে হল। এই ভুলের দায় শুধু শ্রীচক্রবর্তীর উপর চাপালে ভুল হবে। কেননা ইতালীয় বা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে পাহাড়প্রমাণ অজ্ঞতার ঐতিহ্য মার্কসবাদী, অ-মার্কসবাদী উভয় মহলেই বহুদিন ধরে বাহিত হচ্ছে। কথা হচ্ছে এই যে, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের বা চেতনা ও সংগ্রামের কোনো দায় ইউরোপীয় রেনেসাঁস বহন না করলেও, স্বাধীনতার পরিবর্তে পরাধীনতার দিকে ইতালীয় রেনেসাঁস তার ভাগ্যকে টেনে নিয়ে গেলেও মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে তার গৌরব বা দান নাকচ হয়ে যায় নি। কী সেই-সব দান? পাঠকরা মাপ করবেন, গ্রন্থসমালোচনা করতে গিয়ে সে উত্তর দেওয়া চলে না। ফিরে আসা যাক শ্রীচক্রবর্তীর গ্রন্থটির প্রসঙ্গে। ধরে নেওয়া গেল শ্রীচক্রবর্তী ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যে মডেলটি স্থাপন করেছেন সেটি সঠিক অথবা রেনেসাঁস নয়। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় তিনি প্রগতিশীলতার সন্ধানে উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোল পরিক্রমা করছেন। তাহলে তিনি

কী বলছেন ? তিনি বলছেন বাংলার রেনেসাঁস প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও স্বনির্ভর ধনতান্ত্রিক বিকাশের বার্তা ঘোষণা করতে পারে নি। আধুনিক যুক্তিবাদ ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার কিছু বিচ্ছুরণ বাংলার রেনেসাঁসের মধ্যে ঘটলেও সে আলো 'সূর্যের আলোর মতো স্বীয় দীপ্তিতে ভাস্বর ছিলো না, বরং তা ছিল চাঁদের আলোর মতো ধার করা' (পৃ ৩২) পাঠকেরা মাপ করবেন, এইখানে J. A. Symonds-এর এক উক্তি মনে পড়ছে—'Florence borrowed her light from Athens as the moon shines with rays reflected from the sun. The revival was the silver age of that golden age of Greece'. (The Renaissance in Italy, vol. 2, p-31)

একজন বিরুদ্ধবাদী আবার ইতালীয় রেনেসাঁসের চাঁদের রঙকে 'pink colour' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। আসল রেনেসাঁসেরই যখন এই অবস্থা বাংলার নকল রেনেসাঁসের অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখুন।

লেখক বলেছেন পরনির্ভরতার কারণে জাগরণের ধারক-বাহকরা সমাজসংস্কার ও চেতনাগত আন্দোলনে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হরিশ্চন্দ্র প্রমুখদের সীমাবদ্ধতা ও পরস্পর-বিরোধী আচরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। যে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী যেভাবে গোটা উনিশ শতকের মনীষীদের জগৎটি পরিভ্রমণ করেছেন তা সত্যি আমাদের বিমূঢ় করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলে সাঁকো ভেঙে পড়ার আগেই পেরিয়ে যাওয়া।

শ্রীচক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে চমৎকার একটি পয়েন্টের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—ভূমি-ব্যবস্থানির্ভর ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় আন্দোলন বিযুক্ত রেনেসাঁস নায়কদের একটা পার্থক্য আছে—সেটি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। বক্তব্যটি বদরুদ্দীন উমরের অস্বীকৃত পরিগ্রহণ।

শ্রীসুশোভন সরকার প্রদত্ত প্রাচ্যবাদী-পাশ্চাত্যবাদী ধারার সংঘাত ও একই চরিত্রে বিপরীত ধারার পারস্পরিক পরিব্যাপ্তি (interpenetration) তত্ত্বটিকে শ্রীচক্রবর্তী নস্যাৎ করে রামমোহন ও রাধাকান্ত দেবকে প্রায় একই অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। প্রাচ্যবাদী, পাশ্চাত্যবাদী তত্ত্বটির অসুবিধাগত দিক সম্পর্কে শ্রীসুমিত সরকার আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন (A Crititique of the Colonial India, p 16) তবে শ্রী চক্রবর্তীর মতো এতটা বৈপ্লবিক হতে পারেন নি। এরপর যদি তিনি বলতেন রাধাকান্তদেব আহূত ধর্মসভার সভাপতি হবার কথা ছিল রামমোহনের, তাও আমরা বিশ্বাস করতাম। বুদ্ধিজীবী স্তরে রেনেসাঁসের একটি ক্ষীণ প্রগতিশীল ধারার ইঙ্গিত তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন। ইঙ্গিতটি শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে রচিত।

৫. সীমাবদ্ধতা, তাৎপর্য ও ফলশ্রুতি

রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা নিয়ে শ্রীসুশোভন সরকার তাঁর ছেচল্লিশে রচিত আলোচনার উপর একটি ত্রিসূত্রিক সংযোজনী এনেছিলেন ১৯৭৯-র সংস্করণে। তারই উপর ভিত্তি করে শ্রীচক্রবর্তী (ক) ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের ফলশ্রুতি, (খ) ব্যাপক সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলশ্রুতি, (গ) হিন্দু সাম্প্রদায়িক ঝোঁকের ফলশ্রুতিতে দেখিয়েছেন বাংলার রেনেসাঁস-উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ 'পঙ্গু, খর্বিত, বিকৃত', এ রেনেসাঁস ছিল জনবিচ্ছিন্ন এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক। ফলত, দ্বিজাতিতত্ত্বের জনক। তাঁর বক্তব্য আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের যা কিছু evils তার সূতিকাগৃহ রেনেসাঁস এবং সূচনাকারী রামমোহন। অতএব এঁদের বর্জন না করলে পরিত্রাণ নেই। লিখেছেন—'জন্মের

পর ছয়-ছয়টি দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন যে এখনও সঠিক পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে তার পেছনের অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে এই 'রেনেসাঁস'-এর ঐতিহ্য। পড়ে মনে হয় ভারতীয় জীবনের সামাজিক দুর্গতির সূচনা-বিন্দু হিসেবে বদরুদ্দীন উমর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে যে গুরুত্বে চিহ্নিত করেছেন শ্রীচক্রবর্তী অনুরূপ একটা থিসিস দিতে চাইছেন রেনেসাঁসকে কেন্দ্র করে। শ্রীচক্রবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঠিক পথ হাতড়ানোর কথা বলেছেন। এটা অত্যন্ত বেদনার কথা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা ক্রমবিভাজন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছিল যে-যে ইস্যুতে তার মধ্যে রেনেসাঁসের মূল্যায়ন জাতীয় কোনো ইস্যু ছিল বলে তো কিছু জানা নেই। এমনকি মূর্তিভাঙা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তার যে তৃতীয় ধারা (নকশালবাদী) রেনেসাঁস বর্জনের পথে নেমেছিলো, তাদের বিভাজন-প্রসূত সংখ্যা শোনা যায় বারো ছু'ই-ছু'ই। এসবের কারণও কি সেই রেনেসাঁস এবং রামমোহন ?

রামমোহন প্রসঙ্গ

॥ এক ॥

শ্রীচক্রবর্তী রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবন ও শ্রেণীগত অবস্থানটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন টাকাকড়ির ব্যাপারে তিনি ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত। নিজের বাপ-দাদার সঙ্গেও টাকাকড়ি নিয়ে মহাজনি মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 'ভোগীপুরুষ এবং পুরোদস্তুর অ্যারিস্টোক্র্যাট'। রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবন ও নৈতিকতা নিয়ে নানারকম অভিযোগই বিভিন্ন মহল থেকে তোলা হয়েছিল। শ্রীচক্রবর্তীকে ধন্যবাদ যে সেইসব রুচিহীন, অসূয়া-প্রসূত অভিযোগগুলি তিনি আনেন নি। তবে টাকাকড়ি নিয়ে অনৈতিকতার সাক্ষ্য হিসেবে তিনি যে কিশোরীচাঁদ মিত্রের কথা এনেছেন সে ব্যাপারে আর-একটু সততার পরিচয় তিনি দিতে পারতেন, কেননা কিশোরীচাঁদ 'in the absence of all positive evidence' কোনো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন নি। 'The evidence on the subject is too inconclusive to arrive at a decision'—এই তো কিশোরীচাঁদের কথা। (বিস্তৃত আলোচার জন্য দ্রষ্টব্য—The Life and Letters of Raja Rammohun Roy—S.D Collett, ed. by D. K. Biswas and P. C. Ganguly, page 54)। পারিবারিক বিরোধ ও ব্যবহার-বিধি নিয়ে অভিযোগ আনা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের বক্তব্যটি একটু উদ্ধার করা যাক্। 'পৃথিবীর সব দেশের সব যুগের আত্মপ্রত্যয়শীল বুদ্ধিজীবীদের যেরূপ বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, রামমোহন তার নিপীড়ন অনুভব করেছেন অন্তরে—অর্থাৎ সাম্প্রতিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় অনন্বয়। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম-বিশ্বাসগত অনন্বয় জনিত সসন্তায় তিনি বিব্রত হয়েছেন। (রামমোহন / উত্তরপক্ষ পৃ ২২)। বিদ্যাসাগরকেও এই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। শ্রীচক্রবর্তী বলতে চেয়েছেন রামমোহন তাঁর পরিবারকে বিষয়বুদ্ধির অমানবিকতা দিয়ে আঘাত করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার এ নিয়ে গবেষণা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে শেষ হয়ে যায় নি। Sri Ramaprosad Chandra and Dr. J.K. Majumdar সম্পাদিত 'Selections from the Official Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত নথিপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পড়লে বুঝতে পারবেন প্রকৃতপক্ষে রামমোহনই ছিলেন আক্রান্ত। শ্রীচক্রবর্তী হয় এসব জানেন না, নয় জেনেশুনে আমাদের ভুল বোঝাচ্ছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রামমোহন 'ভোগীপুরুষ এবং পুরোদস্তুর অ্যারিস্টোক্র্যাট' ছিলেন। অভিযোগের ইঙ্গিতটা এই এমন মানুষ কখনো 'রেনেসাঁসের জনক' হতে পারেন না। সুধীজনের দৃষ্টি ইতালীয় 'রেনেসাঁসের জনক' হিসেবে বিশ্বখ্যাত পেত্রার্কার জীবনচর্যার দিকে আকর্ষণ করা যাক। তাঁর সম্পর্কে সুপরিচিত সত্য অভিযোগগুলি ছিল এইরকম 'flattery, vanity, restless change from place to place in search of new admirer.' (দ্র J. A. Symonds—The Renaissace in Italy, vol. 2, p 57)। ইতালীয় রেনেসাঁসের বিশ্ববিখ্যাত চরিত্র—কোসিমো, পারেল্কো, লোডোভিকোর মতো রাজন্যক; ইসাবেলা, বিয়াত্রিচের মতো রেনেসাঁস-মহিলা; জুলিয়াস-২য়, আলেকজাণ্ডার-৬ষ্ঠ, লিও-১০মের মত পোপ, ফাইলেলফো, স্যালুটাটি, ক্রুনি, ডাল্লার মতো হিউম্যানিস্ট; লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, টিশিয়ানের মতো বিশ্ববরেণ্য শিল্পী; এরিস্টোর মতো সাহিত্যিক কেউকি এ অভিযোগ থেকে মুক্ত? মাইকেল অ্যাঞ্জেলো একবার রাফায়েলকে তার পোশাক-আশাকের বাহার দেখে কটাক্ষ করে বলেছিলেন—'তোমাকে দেখে শিল্পী বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে নবাব'। টিশিয়ান যে প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকতেন তা রীতিমতো 'ভোগী ও অ্যারিস্টোক্র্যাট' জীবনধারার পরিচায়ক। তাঁদের নীতি-দুর্নীতির কথা না তোলাই ভালো। ফাইলেলফোর মতো অসাধারণ হিউম্যানিস্ট, সেলিনির মতো শিল্পী সিজার বর্গিয়ার মতো রাজন্যক, লুক্রেশিয়া বর্গিয়ার মতো মহিলা, আলেকজাণ্ডারের মতো পোপ এবং মেকিয়াভেলির 'প্রিন্সে'র সঙ্গে যাঁদের অল্পস্বল্প পরিচয় আছে তাঁরা আশা করি জানেন ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে নীতিকে তাঁরা ন্যূনতম মূল্যও দিতেন না। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে এইরকম হতে হবে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কথা তুলে তাদের নায়করা যেন 'ধোয়া তুলসীপাতা' এই ধারণার

মানদণ্ডে যাঁরা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নায়কদের অপমান করেন তাদের অজ্ঞতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করার জন্যই একটু বেশি কথা বলতে হল। শ্রীচক্রবর্তীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক বা বিচারকদের এই গলদটি গোড়া থেকেই রয়েছে। ব্যাপারটা একদমই উলটো। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নায়কদের নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক দায়িত্ববোধ অনেক অনেক বেশি।

॥ দুই ॥

রামমোহনের ধর্মমত তাঁর নিজস্ব নয় তন্ত্রের মহানির্বাণতন্ত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের মত বক্তব্যটিকে শ্রীচক্রবর্তী গুরুত্ব দিয়েছেন অথচ শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের "রামমোহনসমীক্ষা"র চতুর্থ অধ্যায়ে (১৫১-১৯৩ পৃ) এ নিয়ে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ ও অন্য সিদ্ধান্ত রয়েছে তাকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন। শ্রীবিশ্বাসের বক্তব্যসার এইরকম—'রামমোহন সম্পূর্ণ তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তিতেই ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং সে মতবাদও তিনি পেয়েছিলেন একমাত্র মহানির্বাণতন্ত্রের কয়েকটি সর্গ থেকে এই সিদ্ধান্তটি একটি দুর্বল অতিশয়োক্তি মাত্র।··· রামমোহন ছিলেন আদৌ বৈদান্তিক, তন্ত্রশাস্ত্র দ্বারা তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত হলেও, তন্ত্র তাঁর নিকট বেদান্তের পরিপূরক ছিল, যেমন পরিপূরক ছিল পুরাণ, (১৯৩ পৃ)।

রামমোহনের 'ধর্ম জিজ্ঞাসায় সত্য সন্ধানের প্রশ্নটি গুরুত্বহীন', কারণ 'ঐহিক ফলপ্রাপ্তি'র কথা তিনি নিজেই বলেছেন। শ্রীচক্রবর্তী ব্যাপারটাকে না মোচড়ালে যে সাদা তত্ত্বটি পেতেন তা হচ্ছে এই: সমাজের আভ্যন্তর ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হলে সব কিছুই পালটে ফেলার দরকার হয়। 'ধর্মজিজ্ঞাসায় সত্যসন্ধান' আছে কিনা এই মৌলবাদী প্রশ্ন অবান্তর।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সময় চার্চ ও পোপতন্ত্রের খোল নলচে বদলে গিয়েছিল। কোনো একজন পোপ বা ব্যক্তির ইচ্ছা-অভিরুচির প্রশ্ন নয়, বদলটা হচ্ছিল সমাজের ভিত্তিগত স্তরে। সুতরাং ধর্মের (মধ্যযুগীয়) ধরন পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছিল। 'সত্য সন্ধান', মিথ্যা সন্ধান; ভালমন্দের প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন হচ্ছে অনিবার্যতার।

শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, 'একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা-বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আধার হিসেবে এক সমন্বিত ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তাভাবনার আশ্রয় নেবার দরকার ছিল না।' রামানন্দ, নানক, কবির, শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকেই তিনি তা নিতে পারতেন। ভালো কথা। কয়েকছত্র পরে আবার তিনি বলছেন 'যুক্তিবাদী ধর্ম সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রেরণা কতটা ভূমিকা নিয়েছিলো, সেটাও সন্দেহের বিষয়।' পাশ্চাত্য ভাবধারা থেকে নিলেও দোষ, না নিলেও দোষ, এ কেমনধারা বিচার! এবারে আসা যাক আসামির নামে আনা এক নম্বর অভিযোগটির সত্যতার প্রশ্নে। ক্ষিতিমোহন সেন ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মানতে অসুবিধা না থাকলে দৃষ্টি আকর্ষণ করি—ক্ষিতিমোহন সেন রচিত "যোগক্ষেত্র ভারতের পূর্ণসাধক রামমোহন" (দ্র The Father of Modern India : Commemoration Volume of Rammohan Roy Centenary Celebration) ও রামমোহন ও তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় সাধক' (দ্র. Student's Rammohan Centenary Volume (Bengali Section) প্রবন্ধ দুটির দিকে। ক্ষিতিমোহন সেন রচিত 'দাদু'-বিশ্বভারতী (১৩৪২)-র ভূমিকায় কবির, নানক, দাদুর নামোল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ভারতীয় ওই সাধকদেরই সাধনধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি।' রামমোহন সম্পর্কে গবেষকের বক্তব্য জানতে হলে দিলীপকুমার বিশ্বাসের "রামমোহনসমীক্ষা" (পৃ. ১৮৮) দেখা যেতেপারে। তাতেও যদি সন্দেহ নিরসন না হয় তাহলে স্বয়ং রামমোহন রচিত "প্রার্থনাপত্র" (১৮২৩) দেখুন পাঠকরা। তাহলেই পরিষ্কার হবে শ্রীচক্রবর্তীর বিজ্ঞ 'সাজেশন' ছাড়াই রামমোহন তার ধর্মবিশ্বাসের রসদ মধ্যযুগীয় সাধনার ঐক্যসূত্র থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

খুব আশ্চর্য লাগে যখন দেখা যায় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী হয়েও গবেষনামূলক তথ্য গ্রহণ করতে যাঁর এত কুণ্ঠা তিনি কিরকম অনায়াসে রামমোহন-বিরোধিতায় যে মোহিতলাল মজুমদার বিরূপতা ও নিম্নরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য মানছেন (পৃ. ৮৭) অথবা নির্বিচারে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধ বক্তব্যগুলি নামোল্লেখ না করে গ্রহণ করছেন। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রাণপণ গবেষণায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন তিনি বাংলাদেশে নবযুগের প্রবর্তক নন, ঐ যুগের একজন প্রতিনিধি মাত্র। রামমোহন সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তীর প্রতিপাদ্য প্রায়শই রমেশচন্দ্রের অনুসারী। তিনিও রামমোহনের 'পথিকৃৎ' মৌথটিকে বিভিন্ন দিক থেকে আঘাত করতে চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার খুব সংক্ষেপে হলেও বলেছেন—রমেশচন্দ্রের এই রামমোহন-বিরোধিতা অনেকাংশে 'ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ' এবং 'অবমূল্যায়নের প্রচ্ছন্ন চেষ্টা'। (রামমোহন / উত্তর পক্ষ পৃ. ৬০-৬২) মজার কথা হচ্ছে এই যে শ্রীচক্রবর্তী শ্রীপোদ্দারকে ছত্রে-ছত্রে অনুসরণ করলেও এইসব ক্ষেত্রে চোখ বুজে থেকেছেন। উপরন্তু রমেশচন্দ্রকৃত 'ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ'গুলিকে সাদরে বরণ করেছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক—হিন্দু-কলেজের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে রামমোহন সম্পর্কে রমেশচন্দ্র বলেছেন—'Rammohan did not come into picture at all' শ্রীচক্রবর্তী এর

সঙ্গে স্বীকৃত ব্যাখ্যা যুক্ত করে ফাঁপিয়ে লিখেছেন—'রামমোহন ধর্মানুগত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সেকারণেই হিন্দু-কলেজের হিন্দুধর্মবিরোধী পরিবেশ তাঁকে বিরক্ত করেছিল, এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন নি।' প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, এঁরা কেউই শ্রীচক্রবর্তী-ব্যাখ্যাত আশ্চর্য তথ্যটির জনক নন। তিনি কোথায় এই তথ্যটি পেলেন উৎসটা জানালে রামমোহন-হিন্দু-কলেজ সম্পর্কিত গবেষণা অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। এখন পর্যন্ত গবেষণা আমাদের যা জানাচ্ছে তা এইরকম : হিন্দু কলেজের রক্ষণশীল ম্যানেজারবর্গই রামমোহনের হিন্দুধর্ম-বিরূপতার জন্য তাঁকে হিন্দু কলেজের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেন নি। এ বিষয়ে দুটি মোক্ষম প্রমাণ আছে। ১৮৩১ সালে ১৫ই অক্টোবর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত এক হিন্দুর চিঠি। 'তাঁহার (রামমোহনের —শ. মু.) আচার-ব্যবহার হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের ত্যাজ্য হইলেন ইহাকে এক প্রমাণ লিখি। অনেকের স্মরণ থাকিবে যে পূর্বের চিফ জুষ্টিস সর এড বার্ড হাইড ইস্ট সাহেব যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন, তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবন্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গলবোধে অনেক অনেক টাকা চান্দা দিলেন ইহাতে হাইড সাহেব কলেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়দের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন তন্মধ্যে রাম-মোহন রায় গ্রাহ্য হইলেন না, যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে।' (দ্র সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় সং ১৩৫৬ সাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮১)। চিঠির বক্তব্য যে ভিত্তিহীন নয়, তার জন্য স্বয়ং হাইড ইস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির সাক্ষ্যও পাওয়া যাচ্ছে 'They (হিন্দু কলেজের উদ্যোক্তারা-শ. মু.) particularly disliked his associating himself so much as he (রামমোহন-শ. মু.) does with Mussalman not with this or that Mussalman as a personal friend, but being continuously surrounded by them and suspected to join in meals with them.' (সম্পূর্ণ চিঠিটি পাওয়া যাবে A. F. Salahuddin রচিত Social Ideas and Social Changes in Bengal 1818-1835 গ্রন্থের Appendix পর্যায়ে, page 208) এসব তথ্য থাকা সত্ত্বেও শ্রীচক্রবর্তী কিরকম অবলীলায় ঠিক উল্টো কথাটি লিখেছেন।

॥ তিন ॥

সতীদাহপ্রথা বন্ধের চেষ্টা রামমোহনের আগে থেকেই চলছিল এবং সতীদাহপ্রথা-বিরোধী আইন চালু হবার সময় রামমোহন এর বিরোধিতা করে-ছিলেন—রমেশচন্দ্রের এই অনৈতিহাসিক ও বিকৃত বক্তব্যটি শ্রীচক্রবর্তী মুখরোচক করে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু গবেষণা আমাদের জানাচ্ছে সতী-দাহের মতো দুরপনেয় জাতীয় কলঙ্ক উচ্ছেদে রাম-মোহনের সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত অবিচলিত ছিল। আইন পাশ হবার মুখে বরং বেন্টিঙ্ক দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। রামমোহনের ভূমিকা ছিল অতন্দ্র প্রহরীর। কৌতূহলী পাঠকরা সন্দেহ নিরসনের জন্য শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস উদ্ধৃত এতৎসংক্রান্ত পত্র ও বক্তব্যগুলি দেখতে পারেন (রামমোহন সমীক্ষা—পৃ. ৩৪৫-৪৭)। এখানে শ্রীচক্রবর্তী ইচ্ছাকৃত অসততার পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে করার কারণ আছে। কেননা শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারও তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন—'রামমোহন সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে বুদ্ধি-মার্গীয় ও শাস্ত্রীয় যুক্তি উপস্থাপন করে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু বেন্টিঙ্ক যখন আইন প্রণয়নের সময় তাঁর পরামর্শ চান

তখন তিনি আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে-ছিলেন। ড. মজুমদার এই ঘটনার উল্লেখ করে ইঙ্গিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে রামমোহন ঐ অযৌক্তিক প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা করেছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ তো বটেই, অসূয়ারও দ্যোতক। কারণ আইন প্রণয়নের বিরোধিতা ঐ প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা বোঝায় না।···এ ক্ষেত্রে ড. মজুমদার ইতিহাসকে সত্য মর্যাদা দান করেন নি' (রামমোহন/উত্তর পক্ষ-পৃ. ৬০)। পূর্বসূরিদের কোন্ বক্তব্য শ্রীচক্রবর্তী গ্রহণ করছেন আর কোন্ বক্তব্য গ্রহণ করছেন না—দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। বাঙলা সাহিত্য বা গদ্যের বিকাশে রামমোহনের স্থান নিয়ে সুকুমার সেনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্র রুচিহীন অবজ্ঞা প্রকাশ করে-ছিলেন—শ্রীচক্রবর্তীর গ্রন্থে তা গৃহীত। এ বিষয়ে বাঙলা গদ্য বা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মতামতকেই বিষয়াস্তরের পাঠক বা লেখকদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সুকুমার সেন বা ভূদেব চৌধুরী (বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ও রামমোহন-১৯৭৭) কী বলেছেন তা সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে নয়। শ্রীচক্রবর্তী বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতা বিতরণ না করলেই ভালো করতেন। কেননা তাঁর মূল বক্তব্যের পক্ষে রামমোহনের গদ্য লিখতে পারা না-পারার বিশেষ সম্পর্ক নেই।

॥ চার ॥

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলনে কোনো ধার ছিল না, তা নেহাতই আবেদননিবেদন-মূলক, জনস্বার্থ নয় নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ ও ব্রিটিশ রাজের স্বার্থ রক্ষা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তা দেখাতে ১৮২৩-এ প্রেস অর্ডিনান্সের বিরোধিতা, ১৮২৬-এ জুরি বিল, ১৮২৮ সালে রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৮৩০ সুপ্রিম কোর্টে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত রায়ের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার লিখিত বক্তব্যগুলিকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন। প্রেস রেগুলেশন অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ রামমোহন মীরাৎ-উল-আখবার-এর প্রকাশ বন্ধ করেছিলেন। এর সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তী লঘু সুরে লিখেছেন 'কথিত আছে এই প্রেস আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ রামমোহন তাঁর পারসি পত্রিকা মীরাৎ-উল-আখবার-এর প্রকাশ বন্ধ করেন।' 'কথিত আছে' কেন? এ নিয়ে তো রামমোহনের নিজস্ব বিবৃতি রয়েছে। ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল মীরাৎ-উল-আখবার-এর বিশেষ সংখ্যায় পত্রিকা বন্ধের যে তিনটি সুস্পষ্ট কারণ ব্যক্ত করেছিলেন তার সবগুলিই ছিল প্রেস রেগুলেশন অ্যাক্টের বিরুদ্ধে। এই বিবৃতির অনুবাদ Calcutta Journal, April 10, 1923-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বাহুল্যভয়ে উদ্ধার করছি না। এতে দুটি কবিতাংশ উদ্ধার করে পত্রিকা বন্ধের যন্ত্রণাটুকু রামমোহন ব্যক্ত করেছিলেন তার মধ্যে একটির অনুবাদ এইরকম—

'The respect which is purchased with a hundred drops blood, do not thou, in the hope of a favour, commit to the mercy of a porter'। হতে পারে এসব রামমোহন নামক ধূর্ত মানুষটির মিথ্যাচারের ঢাকনা তবে A. F. Salahuddin তাঁর গ্রন্থে W. B. Bayley, The Chief Secretary-র ১৮২২ সালের ১০ অকটোবরের একটি নোট-এর রেফারেন্স দিয়েছেন যাতে দুটি পত্রিকাকে 'harmful to British interest' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি 'the Mirat-ul-Akbar' (page 106)।

জুরি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র J. K. Majumdar তাঁর Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India No 189-210,

page 339-404-এ সংকলিত করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে শাসক উৎখাত করার জেহাদ বা কর্মসূচি অবশ্যই তাতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নিতান্ত অন্ধ না হলে ন্যায়বিচারের সপক্ষে এই আন্দোলনের সততা সম্পর্কে গূঢ় সন্দেহ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

। পাঁচ ।

ভারতকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনে অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা শিল্পীয় বুর্জোয়াদের তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল। রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর শিল্পীয় বুর্জোয়াদের পক্ষ অবলম্বন করে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির ধ্বনধারনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং ভারতে জমিজমা কিনে তাদের স্থায়ী বসবাসের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। এর বিরোধিতা করেছিলেন ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির কর্ণধারগণ ও এদেশের রক্ষণশীল সামন্তশক্তির প্রতিভূ রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। কলোনাইজেশন হলে তার পরিণতি ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক হত, শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের এই চিন্তনীয় বক্তব্যটির পুনরুচ্চারণ শ্রীচক্রবর্তীর গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু 'এ জিনিস রামমোহনের কাম্য ছিল বলে বিশ্বাস করা কঠিন' বাক্যটি তিনি ছেঁটে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে রামমোহন-দ্বারকানাথের ভূমিকাকে প্রগতিশীল ব্যাখ্যা দিয়ে নথিপত্র-সমৃদ্ধ একটি পুরোদস্তর বই লিখেছিলেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন)। তাঁর মত গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো মানে নেই, কিন্তু আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁর নাম বা গ্রন্থটির উল্লেখ বোধহয় আবশ্যক ছিল। রামমোহনের এই চেষ্টা বা চিন্তা ঠিক কি ভুল তা নিয়ে একাধিক মত থাকতে পারে, আছেও এক্ষেত্রে শ্রীপোদ্দার বা শ্রীচক্রবর্তী পোষিত বক্তব্যটির ওজন বেশি বলেই মনে হয়। তবু একটু খটকা লাগে। ভারতে যে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির শাসন কায়েম হয়েছিল, রামমোহনের সংগ্রাম বা বক্তব্যটি ছিল তার বিরুদ্ধে। 'সচেতন সেবাদাস' এতোটা বোকামি করতে গেলেন কেন? ভারতের ক্ষতি করার জন্য নিজের আপাত স্বার্থও কি জলাঞ্জলি দিতে চেয়েছিলেন তিনি?

নীলকরদের সম্পর্কে রামমোহনের সপ্রশংস ও সমর্থনসূচক মনোভাবকে যুক্তিশোধিত করা অনুচিত। Food crop-এর পরিবর্তে 'non food crop'-এর ক্রমবিস্তারের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থাকে ক্রমশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক্তিয়ারে আনা হচ্ছিল, M. N. Roy তাঁর India in Transition' গ্রন্থে তা আলোচনা করেছেন। সেই দিক থেকেই শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু (রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা পৃ ৫৯) শ্রীঅমল ঘোষ (মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর পৃ ১০৭) সামন্ততন্ত্রের serf প্রথার অবসান ঘটিয়ে বেতনভোগী শ্রমিকের জাতক হিসাবে প্রথাটিকে যুক্তিগ্রাহ্য ও 'কৃষকের পক্ষে লাভজনক' বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর নিরিখে শ্রীচক্রবর্তী যদি তা গ্রহণ না করেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। কেউ-কেউ অবশ্য বলেছেন নীলকরদের ভূমিকার নির্বিচার প্রশংসা রামমোহন করেন নি। শ্রীঅমল ঘোষের প্রতি কটাক্ষের পরিবর্তে শ্রীচক্রবর্তী যদি একটু তথ্য বা তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা করতেন পাঠকরা উপকৃত হতেন।

পার্লামেনটারী সিলেক্ট কমিটিতে বাঙলার ভূমি-রাজস্বব্যবস্থা, সরকার-জমিদার-রায়ত সম্পর্ক নিয়ে রামমোহন যে বক্তব্য রাখেন তা নিয়ে একদল বলতে চেয়েছেন এতে রায়তদের স্বার্থরক্ষার প্রশংসনীয় দৃষ্টি-ভঙ্গি আছে। শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন জমিদারদের স্বার্থ-রক্ষাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ছিটেফোঁটা চিন্তাও তাতে নেই। কিন্তু সত্যি কি নেই? মিস মেরী কার্পেনটার ও শ্রীঅমল হোম নির্ণীত

প্রাসঙ্গিক 'Report of the Select Committee of the House of Commons' যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরা বলেছেন ১৯শে অগস্ট ১৯৩১ তারিখে ৫৪টি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রামমোহনের ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। 'Rammohun here appears as the champion of the rackrented ryot, or cultivator.' তিনি বলেছেন, 'while the zamindars or landholders had been greatly benefited by the perpetual settlement of 1793, while their wealth and the wealth of community generally had increased, the poor cultivator was no better off.' তিনি লিখেছেন, 'that it always gives me the greatest pain to allude to it.' (Raja Rammohun Roy —S. D. Collett ed. by D. K. Biswas & P. C. Ganguly, page 314)। এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা, কাণ্ডজ্ঞান, আন্তরিকতা কোনোটারই অভাব ছিল না। 'বিগত চল্লিশ বছর ধরে যে নতুন ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে তা জমিদারদের নিজেদের পরিতৃপ্তি অনুযায়ী জমির পূর্ণ পরিমাপ করতে এবং বারবার জবরদস্তি করে কৃষকের খাজনা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিতে সাহায্য করেছে। এ অবস্থায় কৃষকদের অবস্থোন্নতি জন্য আমি যে ন্যূনতম প্রস্তাব রাখতে পারি ও সরকার যে সংসামান্য কাজটুকু করতে পারেন তা হল কোনো ছলেই যাতে খাজনা বৃদ্ধি না হয় সেজন্য চূড়ান্ত ভাবে খাজনা বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করা; বিশেষতঃ কোনো অবস্থাতেই ছলনাপূর্ণ নতুন জরিপ মারফৎ জমির বর্তমান স্থিরীকৃত ও স্বীকৃত ব্যবস্থার পরিবর্তন করা চলবে না।' (উদ্ধৃত—মূর্তি ভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর, পৃ ১১০)। বস্তুত এক্ষেত্রে অমল ঘোষের বক্তব্য বেশি তথ্যনিষ্ঠ ও ওজনদার। রায়তদের সম্পর্কে রামমোহনের

মনোভাবের একটি নতুন নথি সম্প্রতি শ্রীদিলীপ-কুমার বিশ্বাস আবিষ্কার করেছেন। লর্ড বেনটিঙ্কের কাগজপত্রের পোর্টল্যানড সংগ্রহ থেকে রামমোহনের ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত সেই স্মারকপত্রটি এবিষয়ে অনেকখানি আলোকপাত করেছে। 'সমগ্র স্মারক পত্রটির প্রতিছত্রে করভারনিপীড়িত ও নানা উপায়ে শোষিত কৃষককুলের জন্য লেখকের গভীর সহানুভূতি প্রতিফলিত।' দুঃখের বিষয়, যেহেতু আবিষ্কৃত তথ্য শ্রীচক্রবর্তীর মনোমত নয় সেই কারণে শ্রীবিশ্বাসের এই আবিষ্কারের ব্যাপারটিকে তিনি খুবই অপ্রসন্ন-চিত্তে উল্লেখ ও উপেক্ষা করেছেন। একটি তথ্যকে নানারকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গ্রহণ বর্জন দুই করা যায়, কিন্তু নতুন তথ্য আবিষ্কারকে স্বাগত জানানোর বৌদ্ধিক ঔদার্য না থাকলে তো বিপদের কথা। জমিদারের স্বার্থরক্ষার বিশ্বস্ত দলিলই যদি হত—গবেষণার ক্ষেত্রে তাকে মর্যাদা না দেবার তো কিছু নেই।

। ছয় ।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অধিকাংশ আলোচনাতেই জাতীয়তাবাদের উপাদানকে অতি আবশ্যক বিবেচনা করা হয়েছে। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখ রেনেসাঁস চরিত্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বীজ ছিল কি ছিল না, এই বিচারে প্রায় সকলেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। আশ্চর্যের কথা, বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় রেনেসাঁসের মধ্যে সেই উপাদানটি ছিল কিনা সে কথা কারো মনে পড়ে নি। ধরে নেওয়া গেল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের স্থানকাল-পাত্র আলাদা, সুতরাং তার পক্ষে এই উপাদানটি অত্যন্ত জরুরি। শ্রীচক্রবর্তী শুধু এইটুকু চেয়েই ক্ষান্ত হন নি। তিনি রামমোহনের জাতীয়তাবাদে 'সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধিতা'র একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান না পেয়ে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। ভাষার কিছু নার-

প্যাঁচ সত্ত্বেও এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই রামমোহনকেই তিনি এজন্য দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কোনো অজুহাতেই তাঁর সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থের গণ্ডিতে আপাদমস্তক আবদ্ধ এবং চেতনা বন্ধক দেওয়া চরিত্রকে ঢাকা দেওয়া যাবে না!' (৭৪) জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের কোনো কথাই তাঁর সম্পর্কে উঠতে পারে না। 'রামমোহন জমিদার ও ব্যবসায়ী হিসেবে ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামোর সঙ্গে নিবিড় ও অচ্ছেদ্যবন্ধন-এর কারণে ভারতের সেই সর্বনাশের যাত্রাপথের সারথি ব্রিটিশরাজকে ধারাবাহিক সমর্থন জানিয়ে ও মদৎ জুগিয়ে ধন্য হয়েছেন।' (৭৪) রমেশচন্দ্র মজুমদার রামমোহনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগগুলি এনেছিলেন তার মধ্যে প্রধানতমটি ছিল 'patriotism'-এর ছিটেফোঁটাও তাঁর মধ্যে ছিল না, তাঁর 'love of liberty' ছিল 'abstract' এবং তিনি 'accepted the British rule as an act of divine providence' শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন 'স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীর ধিক্কার উচ্চারিত হলেও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি জমিদার-ব্যবসায়ী রামমোহনের আনুগত্য নিঃশর্ত।' (৪৩ পৃ.) তাঁর মুক্তিসচেতনতা 'কর্মের নয় চিন্তার', তা 'পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করার রাজনৈতিক তাৎপর্য' পায় নি। এতদুভয়ের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শ্রীচক্রবর্তী তাঁর নেতিবাচক বক্তব্যটি সোচ্চার তীব্রতায় ব্যক্ত করেছেন। 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার' উপাদান না পাওয়ার জন্য রামমোহনকে দোষী সাব্যস্ত করতেও কুণ্ঠিত হন নি। রামমোহনের দেশভাবনা বা রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিষয়ে উপাদান এমন কিছু অজস্র নয়। তথাপি যে তথ্য সাজিয়ে রমেশচন্দ্র, পোদ্দার অনুসারী শ্রীচক্রবর্তী তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করছেন, সেই একই তথ্যের মূলধন নিয়ে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস বলছেন রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তার দুটি মহৎ গুণ ছিল 'clarity and objectivity' (p. 385)। তিনি ছিলেন 'earliest champion of constructive nationality', 'A moderniser as he principally is, Rammohan is also India's first dreamer of political independence in the modern age.' (388)। শ্রীহীরেন মুখার্জি এই 'চেতনাবন্ধক দেওয়া চরিত্র'টি সম্পর্কে বলেছেন—'Rammohan deserves to be venerated as the symbol of his country's recovery. However, he never bowed low before the British blast that had overtaken India'.…(Indian Renaissance and Raja Rammohan Roy, Poona, 1973, p 10)। শ্রীঅমল ঘোষ দেখাচ্ছেন, 'প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা একটি মাত্র চিত্রই পরিস্ফুট করে এবং সেটি হল ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনা ও বাস্তব কাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা।' (১৩৬ পৃ.)

রামমোহনের জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক চিন্তার ত্রুটিগুলি দেখাতে গিয়ে শ্রীচক্রবর্তী তাঁকে শুধু সাম্রাজ্যবাদের উপকারী বন্ধু হিসাবে দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বলেছেন কুখ্যাত দ্বিজাতিতত্ত্ব বা মুসলিম-বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতারও জনক তিনি। রামমোহন সম্পর্কে যাঁর ন্যূনতম পড়াশুনা আছে, তিনিও জানেন মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রামমোহনের ধারণা ও শ্রদ্ধার মূল কত গভীর ছিল। ঐস্লামিক ঐতিহ্য তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পরিচর্যায় যে রসদ জুগিয়েছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু কলেজের ম্যানেজারবর্গ কেন তাঁকে বর্জন করেছিলেন সে নিয়ে একটি উদ্ধৃতি তো পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। আমরা শুধু ভাবছি, রামমোহনের এই সাংঘাতিক মুসলিম-

বিদ্বেষী চরিত্রটি শ্রীঅমলেন্দু দে, কাজী আব্দুল ওদুদ, এ. এফ. সালাউদ্দিন এঁদের কারো নজরে পড়ল না। ইংরাজপূর্ব মুসলমান শাসকদের সম্পর্কে রামমোহনের ধারণা ও বক্তব্য কী ছিল তা প্রেস সেন্সরের বিরুদ্ধে 'Appeal to the King in the Council'-এর ৪৩নং অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ধার করছি—'Your Majesty is aware that under their former Muhammadan Rulers the natives of this country enjoyed every political privilege in common with Mussalmans, being eligible to the highest offices in the state, entrusted with the command of armies and the government of provinces and often chosen as advisers to their princes without disqualification or disregarding distinction on account of their religion'…রামমোহনের পড়াশুনা, দেওয়ানের চাকরি, পত্রিকা সম্পাদনা, ধর্মমত, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার, সংসর্গ, দেশভাবনার বিপুল তথ্য ও সাক্ষ্য থাকতে কীকরে তাঁর বিরুদ্ধে এই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগটি একজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের পক্ষে আনা সম্ভব আমরা তো ভেবে পাচ্ছি না। বিশেষ করে এটা তিনি করছেন এমন একটা সময়ে যখন মৌলবাদী শক্তিগুলি একে-একে আমাদের ঐতিহ্য থেকে সেকুলারিজমের শিরদাঁড়াগুলি খুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই সময় রামমোহনকে মৌলবাদী কোনো পরিষদের দপ্তরে জমা দিয়ে আসা কি খুবই জরুরি!

একটি গ্রন্থের প্রামাণিকতা বা গ্রহণ-যোগ্যতা নির্ভর করে মূলত দুটি জিনিসের উপর। প্রথমত, সেই গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্যগুলি সঠিক কিনা বা প্রমাণসিদ্ধ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। দ্বিতীয়ত, মূল্যায়নের যে মানদণ্ড বা বিচারপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিক কিনা। বলে নেওয়া ভালো এটি কোনো গবেষণাগ্রন্থ নয়। রামমোহনের জীবন ও জীবনী নিয়ে কোনো গবেষণা তিনি করেন নি। সুতরাং কোনো তথ্যই তাঁর আবিষ্কৃত নয়। সেটা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে, যে তথ্যগুলি বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রহণ করছেন তিনি, তা কতদূর প্রমাণসিদ্ধ বা গবেষণাপ্রসূত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথ্য নির্বাচন বা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি ন্যূনতম দায়িত্ববোধ বা সততার পরিচয় দেন নি। পরবর্তী গবেষণার রায়ে পরিত্যক্ত বা মৃত বহু তথ্য তিনি ব্যবহার করেছেন। গবেষণার সত্যফসল গ্রহণ করতে কখনো-কখনো কুণ্ঠিত। তথ্য নিয়ে লুকোচুরি খেলায় মেতেছেন। বিকৃত তথ্য ব্যবহার করেছেন বা তথ্যকে বিকৃত করেছেন স্বয়ং। তিলকে তাল ও তালকে তিল করে দেখিয়েছেন। এসবের যোগফল হিসাবে শ্রীচক্রবর্তীর হাতে রামমোহন-জীবনী যা দাঁড়িয়েছে তা পড়তে-পড়তে মনে হবে রামমোহন কোনো মানুষের নাম নয়, দানবের নাম। রামমোহন নামে এক ঘুষখোর, সুদখোর, চতুর, মনুষ্যত্বহীন, মুসলিম-বিদ্বেষী, সতীদাহপ্রথার সমর্থক, ব্রিটিশের পদলেহী, দেশদ্রোহী, সংকীর্ণমনা, স্বার্থসেবী, ভোগী জমিদার ও ব্যবসায়ী উনিশ শতকে আমাদের সর্বনাশ করার জন্য এসেছিলেন। রামমোহন যদি সত্য-সত্যই অনুরূপ এক কুৎসিত মানুষ হন তবে প্রশংসাসূচক কাজের মিথ্যে গৌরব খুলে তাঁর সত্যরূপটি জগৎবাসীকে দেখানোই ভালো। কিন্তু মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যের যোগফল দিয়ে কোনো সতকে দেখানো বোধ হয় সম্ভব নয়। যা দেখানো সম্ভব তা হচ্ছে সত্যের বিকৃতি।

এবারে আসা যাক মানদণ্ডের প্রশ্নে। রেনেসাঁস বিচারের যে মানদণ্ডটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে কী পরিমাণ বিভ্রান্তি আছে তা আমরা সংক্ষেপে দেখিয়েছি। এখন উনিশ শতকের বাঙলাদেশের এক মনীষীর মার্কসবাদী মূল্যায়ন কেমন

হবে সেই প্রশ্ন। মার্কসবাদের বিভিন্ন স্তর থেকে বিভিন্ন রকম মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়েছে। তার কোন্‌টি ঠিক কোন্‌টি ভুল তা নির্ণয় করার কোনো নিরপেক্ষ ও সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড বোধ হয় কারো হাতেই নেই। শ্রীচক্রবর্তীর গ্রন্থটির 'গাইড'-স্বরূপ শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের 'রামমোহন / উত্তরপক্ষ' বইটি হাতে এলে পাঠকেরা দেখবেন গ্রন্থটিতে তিনটি প্রবন্ধ আছে : 'বাংলার রেনেসাঁস ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় রামমোহন', 'রামমোহনের রাজনীতি' ও 'উত্তরকালের দৃষ্টিতে রামমোহন'—এর মধ্যে 'রামমোহনের রাজনীতি' প্রবন্ধটিতে শ্রীপোদ্দার রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। বাকি প্রবন্ধ দুটিতে রামমোহন সম্পর্কে তাঁর পরিচ্ছন্ন ইতিবাচক মূল্যায়ন রয়েছে। শ্রীচক্রবর্তী তাঁর "বাংলার রেনেসাঁস" গ্রন্থটির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রবন্ধটিকেই শিরোধার্য করেছেন। শ্রীপোদ্দারের ইতিবাচক বক্তব্যগুলিকে সযত্নে পরিহার করেছেন।

এই সংখ্যায় মুদ্রিত "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" নিবন্ধে প্রকাশিতব্য তৃতীয় চার্টটি আপাতত প্রকাশ করতে পারা গেল না। পাঠকদের মার্জনা পার্থনা করি। চার্টটি পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

নাটক

এবারের জাতীয় নাট্যমেলা প্রসঙ্গ : এত ভঙ্গ তবু রঙ্গে ভরা

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যসংগঠনের নাম কী হবে এই প্রশ্নে সতীর্থদের সঙ্গে গোড়াতেই মতান্তর এবং পরিণামে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল গিরিশচন্দ্রের। গিরিশ চান নি নামের সঙ্গে "ন্যাশনাল" শব্দটি যুক্ত রাখতে, আঁতুড় অবস্থার সেই নাট্যচর্চাকে "জাতীয়" অভিধায় চিহ্নিতকরণে তাঁর আপত্তি ছিল। পরাধীন দেশের এই নাট্যশিল্পীর সেই অসম্মতির পেছনে ছিল জাতির মর্যাদার প্রশ্ন। হয়তো বা, সেই শুরুর দিনেই—অস্পষ্ট হলেও—তাঁর মনে ছিল "জাতীয় নাট্য" সম্পর্কিত কোনো ধারণা। কিন্তু, "নান্দীকার" যখন তাঁদের আয়োজিত নাট্যোৎসবকে "জাতীয় নাট্যমেলা" বলে চিহ্নিত করেন তখন তিলেকের জন্য সংশয়াপন্ন হতে হয় না তাঁদের এবং আমাদের। এমনকী প্রবল ছিদ্রান্বেষীদের তরফ থেকেও কোনো বিরোধিতা প্রকাশ পায় না। কেন না, আজ থেকে শতাধিক বছরের ব্যবধানে—স্বাধীনতালাভের চার দশক অতিক্রান্ত কালে, বিভেদকামী নানাবিধ রাজনৈতিক আর ধর্মীয় প্ররোচনা সত্ত্বেও, শুভবোধসম্পন্ন ভারতীয় মাত্রই আসমুদ্রহিমাচল বিশাল এই দেশের বিবিধের মাঝে মিলনের সন্ধানী। এই নাট্যমেলার উদ্দেশ্য যে শুধুমাত্র নান্দনিক বা বিনোদন বিতরণের কারণে নয়—বরং আরও ব্যাপক, আরও গভীর—সেই কথাটি উদ্যোক্তারা মনে রাখলেও আমরা ভোক্তারা, যাদের জন্য এই আয়োজন, বোধ হয় সবসময় স্পষ্ট করে তা মনে রাখতে পারি না। তাই কখনো-সখনো অসহিষ্ণু হয়ে একটি অনস্বীকার্য সত্য ভুলে যাই যে, এই সাত বছরে দেশের নানা প্রান্ত থেকে এবং এমনকী একাধিকবার নিকট প্রতিবেশী দেশ থেকে উনচল্লিশটি নাট্য সংস্থা এখানে এসে পরিবেশন করে গিয়েছেন বাষট্টিটি নাট্যকর্ম (পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যসংস্থার পরিবেশিত প্রযোজনাগুলিকে এই হিসেবের অন্তরভুক্ত করা হয় নি)। নিজেদের শহরে বসে জাতীয় নাট্যচর্চার একটি প্রায় সামগ্রিক পরিচয়-লাভের সুযোগ হয়েছে আমাদের। বিভিন্ন প্রদেশের নিত্য নতুন নাট্যচর্চার ফসলের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই নয়, এই নাট্যোৎসবের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে পশ্চিম বাঙলার নাট্যপ্রয়াসের সামগ্রিক রূপটি বোঝার ও সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সেই নাট্যসাধনাকে দেখার।

পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, "জাতীয় নাট্যমেল"-য় লোকনাট্য-নির্ভর প্রযোজনারই যেন আধিক্য। দেশের নানা প্রান্তের নাট্যকর্ম দেখতে পেয়েছি আমরা এই নাট্যমেলায় এবং তার অধিকাংশেরই নির্মিতি লোকনাট্য,আঙ্গিকে। "চরণ-দাস চোর", "ঘাসিরাম কোতোয়াল", "লক্ষপতি রঞ্জন কাথে" ইত্যাদি অভিজ্ঞতার প্রাথমিক মুগ্ধতা স্তিমিত করে দিয়ে আমাদের ক্রমশই ক্লান্ত করে তুলছিল এই ধরনের প্রযোজনাগুলির অন্তঃসারশূন্য আঙ্গিকসর্বস্বতা। অথচ লক্ষণীয়, সেই সঙ্গে পুনেরাম, তিজনবাঈ বা রাজারাম ভাউ-র মতো লোকশিল্পীদের কাছ থেকে প্রাপ্তি কিন্তু ভাস্বর হয়ে আছে নাট্য-রসিকদের স্মৃতিতে।

এবারে বোধ হয় ভেবে দেখা দরকার—প্রথমত, লোকনাট্যনির্ভর আঙ্গিকসর্বস্বতার এই আধিক্য কেন? দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত দু-একটি ব্যতিক্রমী নাট্যকর্ম বাদ দিলে এইজাতীয় অপরাপর প্রযোজনাগুলি যখন শুধুই ক্লান্তিকর তখন লোকনাট্যশিল্পীদের কাজ কেমন করে হয়ে ওঠে অমন তৃপ্তিদায়ক? দুটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলতে পারে একই সঙ্গে। "জাতীয় নাট্যমেলা"-য় "নান্দীকার"নিশ্চয়ই খুঁজে-খুঁজে লোক-আঙ্গিকে গড়ে তোলা প্রযোজনাগুলিই এনে উপস্থিত করছিলেন না এই সাত বছর ধরে। তাহলে "কন্যাদান", "ওয়াড়া চিরেবন্দী", "আত্মকথা", "আজ রাত" বা পশ্চিমবঙ্গের প্রযোজনাগুলিকে তাঁরা উপস্থাপিত করতেন না কখনোই। তাঁদের উদ্দেশ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নাট্যচিন্তা তথা নাট্যচর্চার সঙ্গে পরিচয় তৈরি করা এবং সেই সঙ্গে একটি অন্তর্দেশীয় বোঝাপড়ার ক্ষেত্র গড়ে তোলা। আমাদের দেশের নাট্যচিন্তা এবং নাট্যচর্চায় যদি "দেশজ" হবার অতি-প্রবণতা দেখা দিয়ে থাকে, তবে তার জন্য "নান্দীকার"-কে দায়ী করা চলে না, যেমন আমাদের দেশীয় নাট্যকর্মের মানের কোনো ক্রম-অবনমন যদি ঘটে বা ঘটে থাকে তার জন্যেও দায়ী করা চলে না এই উদ্যোগী, পরিশ্রমী দলটিকে। আঙ্গিক নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে আমাদের দেশের নাট্যকর্ম জীবনমুখী হয়ে উঠতে পারল না—সেই সঙ্গে পারল না আধুনিক হয়ে উঠতে। এইখানে, "আধুনিক" শব্দটিকে "অধুনা"-র অর্থের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে শিল্পের আধুনিকতা সম্বন্ধে ধারণাকে স্পষ্ট করে নেওয়া যাবে না। 'আজ'-এর মধ্যে 'গতকাল'-এর পরিণতিও যেমন 'আগামীকাল'-এর সম্ভাবনাও তেমনি নিহিত থাকে—এই চেতনা শিল্পকে জীবনমুখী হতে সহায়তা করে। আর তাই, জীবনমুখী শিল্প একই সঙ্গে আধুনিক ও চিরায়ত, বিশেষ ও নির্বিশেষ। আবার, এই ত্রিকাল-চেতনার কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র নিজস্ব কালের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ততাও শিল্পকে জীবনমুখী এবং আধুনিক হয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারে। সেই অর্থে "কুলীনকুলসর্বস্ব" বা "নীল-দর্পণ" ছিল আধুনিক নাটক কিংবা "নবান্ন"-র প্রযোজনা হয়ে উঠেছিল জীবনমুখী আধুনিক নাট্য।

জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে "কী বলব" আর শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ঠিক করে নিতে হয় "কেমন ক'রে বলব"। বলার কথাটির ওজন যত হয় বলার ধরনটিকে ততই ওজনে ভারী করে তুলতে হয়। এই 'ধরন'-এর ভার বয়ে চলেছে আমাদের নাট্যচর্চা, বহুদিন হল। গত দুই দশক ধরে আমাদের নাট্যকর্মে লোক-আঙ্গিক-নির্ভরতার চল। ছেষট্টি সালে "ইস্ট ওয়েস্ট থিয়েটার সেমিনার"-এ বিদেশী নাট্যবিদরা জানিয়েছিলেন পশ্চিমের বিবেচনায় প্রাচ্য থিয়েটারের কোন্ লক্ষণ-গুলি মূল্যবান! প্রাচ্য থিয়েটারে নেই অলীক মায়া সৃষ্টির চেষ্টা, নেই আরিস্তোতলের অনুকরণবাদের শৃঙ্খল, অভিনেতার শরীরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ—থিয়েটারের যা নাকি প্রধান দুরূহ বরং দেয়ানেয়ার পারম্পরিক এক আত্মীয়তা আছে প্রাচ্য থিয়েটারে। অনুমান করি, আমাদের নাট্যের স্বরূপ সন্ধানের 'সর্বাধুনিক' তাগিদের শুরুটা তারপরেই।

সাতের দশকের গোড়ায় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর এক গোল-টেবল আলোচনায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে আমাদের নাট্যকে 'ভারতীয়' হতে হলে লোকনাট্যের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের কাছে যেতে হবে। কিন্তু কী করে পৌঁছোব সেই ঐতিহ্যের কাছে—কীভাবে হবে স্বরূপের সন্ধান, তার কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা বোধ হয় ছিল না। আকাদেমীর সক্রিয় সমর্থন এবং সহায়তায় তখন থেকেই বোধ করি শুরু হয়েছিল দেশ জুড়ে 'দেশজ' হবার তোড়জোড়। স্বারূপ্যসন্ধানের তাগিদ যেমন স্বাভাবিক এবং জরুরি, এহেন 'স্বরূপ' আরোপের চেষ্টা তেমনই অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত। আমাদের নাট্যকর্মকে লোকনাট্যের 'দ্বারস্থ' করে 'ভারতীয়' বানিয়ে তোলার এই প্রকল্পের

মধ্যে ছিল সেই অস্বাভাবিকতা ও অসঙ্গতি। কারণ, অন্দরে না ঢুকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে বাইরের চেহারাটাই চোখে পড়ে বেশি করে।

বাঙলা থিয়েটারের অবস্থাটা যে অন্যরকম তার কারণ শতাধিক বছর আগেই লোকনাট্য-ধরনগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা নাগরিক-নাট্য গড়ে তুলতে শুরু করেছিলাম এবং সেই গোড়াপত্তনের যুগ থেকেই আমরা কাহিনী-নির্ভর চরিত্র-প্রধান নাটক আর অভিনয়-নির্ভর নাট্যের পক্ষপাতী। এই চলটা বহু-দিনের। বর্তমান শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষাশেষি থেকে রাজনৈতিক 'সচেতনতা'-র ঝোড়ো হাওয়ায় অভিনয়-নির্ভরতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও বাঙলা থিয়েটার যে লোক-আঙ্গিক নিয়ে মেতে ওঠেনি তার কারণ বোধ হয় ওই দীর্ঘদিনের চল-জনিত লোক-নাট্যের সঙ্গে অপরিচয়ের ব্যবধান ও আরেকটি বড়ো কারণ প্রায় এক দশক জুড়ে ব্রেখ্ট্-এর নামে মাতামাতি। রাজনৈতিক এবং 'ব্রেখ্টীয়' মাতামাতির প্রাবল্য কমে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে এখানকার নাট্যচর্চা যে কিছু কাল হল আবার অভিনয়-নির্ভর হয়ে উঠতে শুরু করেছে সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে 'জাতীয় নাট্যমেলা'-র পরোক্ষ অবদান হয়ত অস্বীকার করা যাবে না। যাই হোক, সেই ছেষট্টিতেই শ্রীহাবিব তন্‌ভির বলেছিলেন,

'...It is our privilege as well as our contemporary obligation to give to the world what may be called a new type of actors, craft, unique as well as modern; new dramatic forms both international and indigenous; and a new type of theatre, at once universal and truly Indian...'

কিন্তু সত্যই কেমন হবে সেই নাট্যধরন যা বিশিষ্ট ও আধুনিক এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও দেশজ—বিশ্বজনীন ও ভারতীয়? আমাদের দেখা অন্যান্য কাজগুলির কথা না হয় বাদই দিচ্ছি; তাঁর নিজের প্রযোজনাগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নি তেমন কোনো আধুনিকতা বা আন্তর্জাতিকতা কিংবা ভারতীয়ত্ব। তাছাড়া "চরণদাস চোর"-এর প্রয়োজনা-শৈলীর দেশজতা আর বিশিষ্টতা পরবর্তী প্রযোজনা-গুলিতে পৌনঃপুনিকতায় ক্ষীয়মাণ বলেই মনে হয়েছে আমাদের অনেকেরই। শ্রীতন্‌ভিরের এই কথাগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠা তাগিদটি কি শুধু একা তাঁরই? এমন এক চিন্তার ভ্রান্তি কি আমাদের নাট্যচর্চাকে প্রায় দুই দশক ধরে বিভ্রান্ত করে রেখেছে? আমরা কি এতদিন বিদেশীদের চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি আমাদের লোকসংস্কৃতি আর বিদেশীদের চোখে কেমন দেখাবে আমাদের সংস্কৃতিচর্চা তা নিয়ে ভেবে অযথা সময়-উদ্দীপনা-শ্রম-অর্থের অপচয় করেছি? হয়ত তাই। নইলে লোকনাট্যের দরজায় দাঁড়িয়ে তার বহিরঙ্গ নিয়ে মজে রইলাম কেন? কেন লোক-নাট্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে চিনে নিতে পারলাম না তার প্রাণশক্তি?

জীবনের—জীবনদর্শনের মধ্যে সেই আহৃত প্রাণ-শক্তি সঞ্চারিত করে কেমন করে তা একই সঙ্গে আধুনিক ও ভারতীয়, বুঝিবা বিশ্বজনীনও করে তোলা যায় রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন তাঁর নাটকে। দেখিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য তাঁর "নবান্ন"য়; আর শ্রীশম্ভু মিত্র তাঁর "চাঁদ বণিকের পালা"য়। সেই প্রাণশক্তি যখন আহরণ করা গেছে—যেক্ষেত্রে, যে মাত্রাতেই হোক—নাট্যকর্মও তখনই বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে: "চরণদাস চোর", "ঘাসিরাম কোতোয়াল", লক্ষপতি রজন কাথে", "বর্ণস বন" "নাগমণ্ডলম" বা "নাথবতী অনাথবৎ" ইত্যাদির কথা মনে করা যেতে পারে এই সূত্রে। পুনেরাম, তিজনবাঈ, রাজারাম ভাউ বা তামাশা, রামলীলা, যাত্রা, রাস ইত্যাদি যখন আমাদের মুগ্ধ করে—বিভোর করে রাখে তখন বোধহয় মনে রাখা দরকার যে বহুযুগ ধরে পুরুষানুক্রমে পরিশীলিত আর অনু-শীলিত লোকশিল্পের এই ধরনগুলি তাদের বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ, তাদের প্রাণশক্তি—সব মিলিয়ে তাদের

যে সত্তা তার সবটুকু দিয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়ান্বিত করে। লোকশিল্পী ও লোকশিল্পের ভোক্তা—দুয়ের মধ্যে থাকে এক নিবিড় পরিচয় ও বোঝাপড়া। ভোক্তার রসতৃষ্ণার সম্পূর্ণ সন্ধান রাখেন শিল্পী আর তাদের চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়ে মিটিয়ে নিতে জানেন তিনি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির তাগিদ। কোনো শিল্পধরনই ভুঁইফোড় বা স্বয়ম্ভু যেমন নয় তেমনি নয় অপরিবর্তনীয় বা স্থাণু। তার গড়ে-ওঠা এবং ক্রমেই গড়ে উঠতে থাকার প্রক্রিয়ার পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে একাধিক পরস্পরবিজড়িত কারণ। আবার, বিপ্রতীপ এবং পরস্পরবিরোধী কিছু কারণে সেই প্রক্রিয়ায় কখনো-সখনো আসতে পারে বিভ্রান্তি। যেমন ঘটে গেছে বুঝি এই গত দুই দশক ধরে।

আকাদেমী মঞ্চে সাতই থেকে তেরোই ডিসেম্বর পরিবেশিত হল সাতটি নাটক: জুলয়া (ইপটা, মহারাষ্ট্র), বারিষওয়ালা (পদাতিক, কলকাতা), পঞ্চরাত্র (রঙ্গবিদূষক, ভোপাল) আজ রাত (অঙ্ক, বোম্বাই), মহাভোজ (নৌরঙ্গ, জম্মু), শকুন্তলা (রঙ্গমণ্ডল, ভোপাল) এবং রামলীলা (পার্বতীয় কলাকেন্দ্র, দিল্লী)।

জাতীয় নাট্যমেলায় পরিবেশিত এবারের সবকটি প্রযোজনাই হয় রূপান্তরিত নয় ভাষান্তরিত। রূপান্তর প্রাচীন মহাকাব্য, নাট্যকাব্য বা উপন্যাস থেকে নাটকে এবং বিদেশী থেকে স্বদেশী পটভূমিতে। ভাষান্তর ইংরেজি ও সংস্কৃত থেকে। "বারিষওয়ালা" এবং "আজ রাত" ন্যাচারালিস্ট ঘরানার। "শকুন্তলা" মণিপুরের লোকনাট্য দাঙীয় রাস-এর আঙ্গিকে নির্মিত। "পঞ্চরাত্র"-এ দেখা গেছে সংস্কৃত নাট্য-আদলের সঙ্গে লোক-আঙ্গিক ধাঁচের মিশেল। পার্বতীয় কলাকেন্দ্রের "রামলীলা" সরাসরি লোক-নাট্যধর্মী। অন্যদিকে "জুলয়া"র আশ্রয় সঙ্গীত আর নৃত্যনির্ভর লৌকিক নাট্যপ্রথায়। জম্মুর "নৌরঙ্গ"-এর প্রযোজনা "মহাভোজ" নিরাভরণ কায়িক অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল। নাট্যমেলায় পরিবেশিত নাটকগুলি আলোচনার জন্য তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত—লোকনাট্যের কাছে কোনো না কোনোভাবে ঋণী যেগুলি, দ্বিতীয়ত—ওয়ার্কশপ-ভিত্তিক আঁসাবল্‌-ধর্মী প্রযোজনা, ও তৃতীয়ত—ন্যাচারালিস্ট প্রযোজনাগুলি।

"শকুন্তলা" এবং "পঞ্চরাত্র"—দুইই সংস্কৃত নাটকের হিন্দি ভাষান্তর। কালিদাসের নাটকটির অনুবাদ মোহন রাকেশের, আর তুলনায় স্বল্পপরিচিত ভাস-এর নাটকটির ভাষান্তর ও পুনর্লেখন রাজেশ যোশীর। উল্লেখ্য, কালিদাসের এই নাটকটির বাঙলা অনুবাদ মঞ্চায়িত হয়েছিল কিছুকাল আগে, থিয়েটার সেণ্টার নাট্যদলের উদ্যোগে। "শকুন্তলা"র নির্দেশক সাংখ্য ইবোতোমবে মঞ্চ ও দর্শকের মাঝখানে কোনো আড়াল রাখেন নি শুরু থেকেই। রাসযাত্রার আসরের মতো করেই যেন সাজাতে চেয়েছেন মঞ্চকে তিনি। মঞ্চতলের মাঝখানে গোলাকৃতি আলপনা, সেই আলপনাকে মাঝখানে রেখে মঞ্চের উপর তৈরি করা হয়েছে, সরু ফ্রেমে সাদা কাপড় আর ফুলের মালা জড়িয়ে, চারখানা আর্চসহ এক গোলাকার মণ্ডপের আদল। এই মণ্ডপের সীমানার বাইরে সম্মুখ-মঞ্চের পাশ ঘেঁষে বসে বাজনদাররা তাদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। এক দীর্ঘ পূর্বরঙ্গ দিয়ে শুরু হয় এই প্রযোজনা। দিক্‌পূজার পরে গীত হয় মূল নাটকের নান্দী "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী…' সংস্কৃত নাট্যের রীতি অনুসারী এই শুরু। কিন্তু বাদ যায় মূল নাটকটির প্রস্তাবনা অংশ।

"শকুন্তলার"-র অভিনয়, সংলাপকথন, গান আর রাসনৃত্য ধরনে বাঁধা চলন দিয়ে গড়ে তোলা। বাইরের থেকে কেনো শিল্পধরন আত্মীকরণের চেষ্টায় বিপত্তি হল এতে মাত্রার ভারসাম্য বজায় থাকে না প্রায়ই। ফলে, শিল্পধরনটির নিজস্ব জোরটি যেখানে ঠিক সেখানেই বাসা বেঁধে বসে দুর্বলতা। আরও বড়ো বিপত্তি হল আধারটি কী হবে সেটি আগেই ঠিক করে নিয়ে সম্পূর্ণ বিবেচনারহিত হয়ে আধেয়টি তার মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা করা। আত্মকৃত এই একমাত্রিক আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে কালিদাসের সৃষ্টির কাব্যময়তা এবং জীবন-অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না কোনোমতেই। ফলে প্রেমের উন্মেষ ও তার মোহময় বিস্তার, কামনার তীব্রতা, প্রোষিতভর্তৃকার বিরহ, পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বামিগৃহ যাবার কষ্ট, প্রত্যাখ্যানের অপমান, স্মৃতি-পুনরুদ্ধারের পরবর্তী সন্তাপ ও গ্লানি, পুনর্মিলনের পর অভিমান-অনুতাপ-ক্ষমা-প্রার্থনা আর আনন্দ—বিচিত্র ও বহুস্তরিক জীবন-অভিজ্ঞতার সমস্তটাই অপ্রাপণীয় হয়ে থাকে। অভিনয় দেখতে-দেখতে নাটক পাঠকালীন অনুভবগুলিকে স্মৃতি থেকে আহরণ করে এনে ভরাট করে যেতে হয় ফাঁক। মোহন রাকেশের অনুবাদ সেই কাজটিকে সহায়তা করার চেষ্টা করে চলে আপ্রাণ। কিন্তু সম্পাদনায় বাদ পড়ে দুর্বাসার অভিশাপ, ধীবরের অঙ্গুরীয়-অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া ও অভিজ্ঞান-দর্শনে স্মৃতি ফিরে পাওয়ার মতো নাট্যকাহিনীর জরুরি অংশ। তবু সব দায় আঙ্গিকের একথা বললে একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হবে সমালোচনা।

আঙ্গিকের অতি-সীমিত অবকাশের মধ্যেও যে নাটকটির প্রতি বিন্দুমাত্র সুবিচার সম্ভব হয় নি তার দায়িত্ব "রঙ্গমণ্ডল"-এর অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও। এতই দুর্বল এই অভিনয় যে সন্দেহ হয় তাদের অক্ষমতা ঢাকতেই বুঝি আয়োজন করতে হয়েছিল আঙ্গিকের আতিশয্য। কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফলের পূর্ণতা—সম্ভাবনার এই ব্যাপ্তিকে প্রযোজনার মধ্যে ধরার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না, অথচ এই নাটকটির যে কোনো নির্দেশকের কাছে সেটাই হবার কথা সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। তবু পুরোপুরি অনুপভোগ্য ছিল না এই উপস্থাপনা এবং তার কৃতিত্বের পুরোটাই মহাকবি কালিদাসের। ভালো নাটকের নিজস্ব জোর দুর্বলতম প্রযোজনাকেও পরাস্ত করে কোনো না কোনোভাবে একরকম জিতে যায় ঠিক।

"পঞ্চরাত্র" সম্পর্কে এই কথাটি বলা যায় না কিছুতেই। নাট্যশাস্ত্রের বিচারে ভাস-এর এই রূপক-টির গোত্র যাই হোক না কেন,—অত্যন্ত দুর্বল এই রচনা। বোধ করি পুনর্লেখনের চেষ্টাতে সেই দুর্বলতা বেড়েছে। দুর্বলতর হল এর প্রযোজনা। রাজেশযোশী সংস্কৃত নাটকে লোকনাট্যের উপাদানের নামে কিন্তু নাচ-গান মিশিয়ে 'পঞ্চরাত্র"কে করে তুলেছেন 'না ঘর্‌কা, না ঘাটকা'। বংশী কাউলের নির্দেশনা শেষরক্ষা করতে পারে নি। আর, সেই ভরাডুবিতে তাঁর সঙ্গে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়েছেন অভিনেতৃবর্গ। এক যুক্তিহীন বুদ্ধিবিবর্জিত অতিকৃতি-নির্ভর 'ডেক্লামেশন'কে অভিনয়ের নামে চালিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে "রঙ্গ-বিদূষক" দর্শকের মনন বা অনুভূতি কোনোটিকেই তৃপ্ত করতে পারে নি। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুরুগণ চেষ্টা করলে এবং সময়মত হস্তক্ষেপ করলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এড়ানো যেত—নাটকটির এই বক্তব্য এবং আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে তুলে ধরা—প্রযোজনার এই উদ্দেশ্য, দুইই জেনে নিতে হয় প্রচার-পত্র পড়ে, অভিনয় দেখতে-দেখতে তা বুঝে নেওয়া সম্ভব হয় না। পূর্ববর্তী নাট্যমেলায় দেখা "রঙ্গমণ্ডল"-এর সফল প্রযোজনা "ইনসাফ কি ঘেরা" দেখার স্মৃতি "শকুন্তলা" সম্পর্কে এক আগাম আগ্রহ তৈরি করে-ছিল। সেই আগ্রহ যেমন পর্যবসিত হল হতাশায় তেমনই "রঙ্গ-বিদূষক" প্রথম বারের প্রযোজনায় আমাদের মনে তৈরি করে দিয়ে গেলেন এক ঔদাসীন্য।

"মহাভারত"-এর তুলনায় "রামায়ণ" বোধ হয় সর্বদাই কম আকর্ষক। "রামায়ণ"-এর কাহিনীতে নেই "মহাভারত"-এর বহুস্তর জটিলতা, চরিত্রগুলিও তুলনার একমাত্রিক ও পাণ্ডুর। আদতে দশরথ, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, কৈকেয়ী, মন্থরা—মোহন উৎপ্রতি নির্দেশিত এই গীতাভিনয়ে পূর্ণাঙ্গ বহুমাত্রিক চরিত্রের

রূপ পরিগ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রধান কারণ গাইবার ধরনে সামান্য হেরফের থাকলেও প্রতিটি চরিত্রই গান গেয়েছে মূলত একই ধাঁচের সুরে। কৈকেয়ী, মন্থরা এবং রাবণের গানের সুরের সঙ্গে অন্যান্যদের গানের সুরের পার্থক্য এতই সামান্য যে তা দিয়ে চরিত্রগুলির মধ্যে ভালোমন্দের এক ক্ষীণ বিভাজনরেখাই শুধু টানা যায়। আসলে, টাইপ-গুলির বিভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করা বা তাদের খানিকটা রক্তমাংসের করে তোলা—কোনোটাই অভিপ্রেত ছিল না এই প্রযোজনায়। রামায়ণ-কাহিনী মূলত গান এবং সেই সঙ্গে সামান্য অভিনয় দিয়ে বিবৃত করাই ছিল লক্ষ্য। সমস্তটাই যেন সচিত্র রামায়ণের সচল সংস্করণ। তবু "শকুন্তলা" বা "পঞ্চরাত্র"-এর তুলনায় "রামলীলা" উপভোগ্য ছিল অনেক বেশি। কারণ আঙ্গিক নিয়ে কোনো আতিশয্য বা প্রযোজনাকে 'প্রাসঙ্গিক' করে তোলার কোনো ভান-ভনিতা ছিল না এক্ষেত্রে। একেবারে লোকনাট্যের ধরনে পরিবেশিত হল রামায়ণকাহিনী। সীতার স্বয়ংবর ও রামের বনগমন নিয়ে অনাড়ম্বর এই গল্পকথনে অতিদীর্ঘতাই ছিল একমাত্র দোষ। এবং মাঝে-মধ্যে সামান্য সুর-বিচ্যুতি সত্ত্বেও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রত্যেকেই বেশ গেয়েছেন।

অভিনয়ের অতি সীমিত অবকাশের মধ্যেও মনে ছাপ ফেলেছেন সীতা-বেশী চন্দ্রা বিস্ত্, তাঁর নীরব অভিব্যক্তিতে সীতার মনোভাবের নানা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বার-বার। শূর্পনখা-র ভূমিকায় নীলম তিওয়রিও তাঁর স্বল্পস্থায়ী উপস্থিতিতে আমাদের অভিনিবিষ্ট করে তোলেন, যদিও সেই সন্ধ্যায় তাঁর কণ্ঠস্বর স্ববশে না থাকায় গান গাইতে গিয়ে তাঁকে একাধিকবার নেপথ্য সহায়তার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। গোবিন্দ পাণ্ডে অভিনীত রাবণের ভীষণতাকে আবৃত করে ছিল এক মজাদার মোড়ক। সীতার স্বয়ংবরসভায় রাবণের আবির্ভাব অনেককে বিস্মিত করতে পারে, কিন্তু লোকনাট্যের ঐতিহ্যে কাহিনীর এই বিষয়ভেদ পাওয়া যায়।

"রামলীলা"-র অভিনয় শুরু হবার আগে এক সুপরিচিত সাপ্তাহিকের নাট্যসমালোচক খেদের ছলে পরিহাস করেছিলেন সেই সন্ধ্যার রামায়ণে হনুমান থাকবে না বলে। মোহন উৎপ্রতি সম্ভাব্য এমন খেদের কথা মাথায় রেখেই নিশ্চয়ই সীতার স্বয়ংবর-সভায় কিঞ্চিৎ 'হানুমানিক' আয়োজন রেখেছিলেন। সভায় পাণিপ্রার্থী বিভিন্ন রাজাদের আচার-আচরণ, স্বয়ংবরের শর্ত অনুযায়ী হরধনু উত্তোলনের চেষ্টায় নাজেহাল হওয়া ইত্যাদিকে ছাপিয়ে যায় শর্তপালনে প্রবৃত্ত হবার আগে জনৈক রাজার একের পর এক পোশাক খুলে ক্রমান্বয়ে নিজেকে প্রায় বিবস্ত্র করার কৌতুক আয়োজনটি। এমনতর ভাঁড়ামি বা 'হর্স প্লে' আমাদের রুচিসম্মত হোক বা না হোক, কিন্তু লোকনাট্য আঙ্গিকসুলভ এবং ওই আঙ্গিকে প্রায় এক আবশ্যিক উপাদান।

"রামলীলা"-র অভিনয়ই ছিল এবারের "জাতীয় নাট্যমেলা"-র শেষ উপস্থাপনা। সেই রাতে অভিনয়ের শেষে শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আমাদের জানালেন ধর্মের নামে সাম্প্রতিক উন্মত্ততার মধ্যেও যখন রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতারা ক্ষুদ্রচেতনা স্বার্থান্বেষীর ভূমিকায় মেতে আছেন তখন 'পার্বতীয় কলাকেন্দ্রে'র এই "রামলীলা" প্রযোজনায় রামের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন এক মুসলিম অভিনেতা—এম. এ. নকভি। আমরা একথাও জানতে পেলাম যে এই গোষ্ঠী উন্মত্ততার কেন্দ্র অযোধ্যাতে গিয়েও অভিনয় করে এসেছেন সম্প্রতি।

উত্তম বন্দু তুপের উপন্যাস অবলম্বনে চেতন দাতার লিখেছেন "জুলয়া" নাটকটি। একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলেছে কাল এবং অংশত এই দেশও। তবু ভারতবর্ষের অনেকাংশে কয়েক শতকের প্রাচীন কোনো-কোনো প্রথা এখনও কিছু সম্প্রদায়কে অন্ধকারের মধ্যে নিগড়বদ্ধ করে রেখেছে। 'ইয়েলাম্মা'-র দৈবী প্রভাবে বাঁধা পড়ে থাকা 'যোগ'তে' তেমনই এক সম্প্রদায়। দেবীর কাছে

সমর্পিত হওয়ার ফলে, শিশুকালেই পরিবার থেকে উৎখাত-হওয়া এই 'যোগতিন' আর 'যোগতে'-দের বিবাহ নিষিদ্ধ। নপুংসক যোগতেরা সমকামী এবং যোগতিন্‌রা ইয়েল্লামার সঙ্গে "জুলয়া" নামক আনুষ্ঠানিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে স্থানীয় কোনো নেতৃস্থানীয় ধনী ব্যক্তির রক্ষিতার জীবন নির্বাহে বাধ্য। এই মিলনসম্ভূত শিশুদেরও পারিবারিক জীবনযাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। এমনই এক কিশোরী জশন—যোগতিন ইয়াল্লুর কন্যা। স্কুলে যায় সে আর বিদ্যালাভের সুযোগ পেয়ে স্বপ্ন দেখে সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে, স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে—হবে হাসপাতালের নার্স। কিন্তু সামান্য সেই স্বপ্নও সত্য হয়ে ওঠে না তার জীবনে। বঞ্চনা, ধর্ষণ ঠেলে দেয় তাকে অন্ধকারের মধ্যে।

গাঁয়ের মোড়লের পুত্র জয়ন্ত, সহপাঠী দশান্না, অন্য যুবকটি, যে তাকে আত্মহত্যার চেষ্টা থেকে নিরস্ত করে, এবং শহরের বারাঙ্গনাটি—এরা প্রত্যেকেই তাকে দেখায় বেঁচে থাকার অন্যতর পন্থা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা সবাই তাকে বিভ্রান্তই করে কিংবা কথা দিয়ে কথা রাখে না। ফলে যোগতিন্ হওয়া ছাড়া অসহায় জশনের আর কোনো রাস্তা থাকে না। যোগতিন্ হতে বাধ্য হয় সে যেহেতু যোগতিনের মেয়ের যোগতিন্ হওয়াই বিধিলিপি। কিন্তু নিজের মাতৃত্বঞ্চনাবঞ্চিত কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে জশন একদিন—ছুঁড়ে ফেলে দেয় নদীতে 'ইয়েলাম্মা'র মূর্তি। অন্ধকারের দেবীর করাল ছায়া সরে গিয়ে শুভ দৈবীশক্তির আলোয় সিঞ্চিত হয় জশন আর তার বক্ষোলগ্ন শিশুকন্যা।

নির্দেশক ওয়াসন কেন্দ্রের বয়সে তরুণ। কিন্তু নাটকটি গড়েছেন অভিজ্ঞ দক্ষতায়। নাটকের মঞ্চ একটি লম্বা প্ল্যাটফর্ম ব্যতীত নিরাভরণ। প্ল্যাটফর্মটি মঞ্চের পিছনে। দুই প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে এসেছে সামনের দিকে, মঞ্চের মধ্যভাগে। গাইয়ে এবং যন্ত্রীদের আসন নির্দিষ্ট রয়েছে ডানদিকের উইংসের কাছাকাছি। গোড়াতে 'নান্দী' আছে, আছে 'প্রস্তাবনা' এবং সূত্রধার। প্রস্তাবনায় দেখানো হয় শুভ আর অশুভের মাঝে জশনের টানাপোড়েন। শুভের প্রতীক এক্ষেত্রে দেবী সরস্বতী আর অশুভের প্রতিমূর্তি দেবী ইয়েল্লাম্মা। নাটকের শেষে জশন যখন প্রতিবাদে সফল এবং অশুভের দেবী যখন বিসর্জিত, তখন দেখতে পাই সরস্বতীর পুনরাবির্ভাব এবং জশনকে আশীর্বাদপ্রদান। নির্দেশক কোনো নির্দিষ্ট লোক-আঙ্গিকের উপর নির্ভরশীল না থেকে লোকনাট্যের কিছু-কিছু উপাদান ব্যবহার করেছেন। সুনির্দেশনার ছোঁয়া নাটকের বহু জায়গায়।

জশনের উপর গণধর্ষণ, তার সন্তান-প্রসব আর প্রতিমা-বিসর্জনের দৃশ্য অসাধারণ মাত্রাযুক্ত হয়েছে 'ব্লকিং', 'কম্পোজিশন' এবং আলোকসম্পাতে। সমগ্র নাটকটি আঁটো-সাঁটোভাবে গ্রথিত লৌকিক ছন্দে, সুরে, নৃত্যে আর আচার-অনুষ্ঠানে। "জুলয়া"-র এই মঞ্চাভিনয় হয়তো আরো অর্থবহ হয়ে উঠত যদি 'যোগতে' সম্প্রদায়ের মানুষের নিজস্ব নৃত্য-গীতশৈলী ব্যবহার করা যেত। পরিচালক নাট্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভিনয়কে মর্যাদা সহকারে জায়গা করে দিয়েছেন অনেকখানি। জশন-এর ভূমিকায় অদিতি মুলগুন্দ ও যোগতে পারমু বেশি ময়াজি বিন্দের অভিনয় এই প্রযোজনার প্রতি আমাদের অভিনিবেশকে শিথিল হতে দেয় নি কখনোই। আর এখানেই নির্দেশক কেন্দ্রের দর্শককে জয় করে নিয়েছেন। প্রযোজনায় শতেক আয়োজন, নির্দেশকের হাজারো কায়দা কৌশল নয়, অভিনয়ই যে শেষপর্যন্ত নাট্যের প্রাণকেন্দ্র—এই সত্য আরও একবার প্রমাণিত হল "জাতীয় নাট্যমেলা"র প্রথম সন্ধ্যাতে "জুলয়া" দিয়েই। এই সত্য আরও একবার শক্ত ভিত পেল দ্বিতীয় সন্ধ্যায় "বারিষওয়ালা" প্রযোজনার মাধ্যমে।

এবারের "জাতীয় নাট্যমেলা"য় বাঙলার, বা বলা

ভালো কলকাতার, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ছিল একটি হিন্দি প্রযোজনার উপর। এই প্রযোজনাটি তৈরি করার কাজ শেষ করে এই সেদিন কলকাতাতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন মার্কিন নির্দেশক রড্‌নি ম্যারিয়ট্। "পদাতিক" গোষ্ঠীর "বারিষওয়ালা" নিঃসন্দেহে এই উৎসবের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। পাঁচের দশকে লেখা মঞ্চসফল এবং পরবর্তী কালে চলচ্চিত্রায়িত এই আমেরিকান নাটকটি ভাষান্তরিত করে প্রযোজনা করেছেন তাঁরা। রূপান্তরিত না-করার সিদ্ধান্ত যে কারণেই নেওয়া হোক না কেন, সার্থকই হয়েছে। মার্কিন নির্দেশক প্রয়াত ম্যারিয়ট ও মার্কিন শিল্প-নির্দেশক শ্রীস্টোফার ব্যারেকা বহিরঙ্গের দিক থেকে 'বিদেশী' ভাব বজায় রাখতে যে যারপরনাই সতর্ক ও সযত্ন ছিলেন তা স্পষ্ট। মানতেই হবে এতদ্দেশীয় নেপথ্য-শিল্পীদের উপযুক্ত সহায়তাই তাঁদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলেছে। "বারিষ-ওয়ালা"র শুরুতেই পাত্র-পাত্রীদের সংলাপে বোঝা যায় প্রচণ্ড খরা ও গ্রীষ্মে মুমূর্ষু দেশ। এই শুষ্কতা প্রকৃতি থেকে বুঝি সঞ্চারিত হয়ে যায় মানুষের মধ্যে —অন্তত অধিকাংশের মধ্যেই। ব্যতিক্রম শুধু কারি পরিবারের কর্তা এইচ. সি. আর তার কনিষ্ঠ পুত্র জিমি। জিমি কিশোর—ভালবাসা আর স্বপ্ন আঁকড়ে থাকতে চায় সে। পিতার সমর্থন তার দিকেই। বাস্তববাদী হিসেবে মানুষ নোয়া। জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সংসারের হাল বইবার দায়িত্ব তারই। স্বপ্ন বা প্রেম-ভালবাসার মূল্য তার জমাখরচের হিসেবের খাতায় তোলার মতো নয়। ভাইকে শাসনের বাঁধনে বাঁধতে চায় নোয়া। কারির একমাত্র কন্যা সাদামাটা চেহারার লিজি কাউকে ছলাকলায় ভুলিয়ে নিজের জন্য পাত্র হিসেবে জোটাতে চায় না আদৌ, নোয়া-র কথাই সত্যি বলে মনে হয় তার—ভাবে অবিবাহিত কুমারী জীবনযাপনই তার ভবিতব্য। বুকফাটা মাটির মতো বন্ধ্যা বুঝি তারও জীবন। এমন অবস্থায় প্রবেশ "বারিষওয়ালা"র, নাম তার বিল স্টারবাক। আশ্চর্য এক নাম ভেবেছেন ন্যাশ চরিত্রটির জন্য।

বিল-উইলিয়ম। উইলিয়ম-ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; স্টারবাক-নক্ষত্রহরিণ। স্বপ্নের সদাগর সে, কথার জাল বুনে-বুনে গল্প বলে, আশা সঞ্চারিত করে বিশ্বাসী মনে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বৃষ্টি এনে দেবে সে। কারি-পরিবারের কর্তা আর জিমি বিশ্বাস করে তাকে। নোয়া কিছুতেই পারে না, গভীর সন্দেহ তার—লোকটি আসলে ঠগ। লিজি প্রাথমিক সন্দেহের পর কেবলই দোলে আর দোলে— বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে দোলে। স্টারবাক কেবলই লিজিকে বলে বিশ্বাস করতে যে সে সাদা-মাটা নয়, সে সুন্দরী —সত্যিই সুন্দরী। লিজি—ন্যাশ ভেবেছেন ভালো —লিজি-এলিজাবেথ-এলিশেবা, ঈশ্বরের কাছে সমর্পিতা। আর একজনও আছে—সে ফাইল, ডেপুটি শেরিফ। স্ত্রী ত্যাগ করে চলে যাবার পর থেকে ফাইল্ এক কাঠিন্যের বর্মের আড়ালে ঢেকে রাখে নিজেকে সদা-সর্বদা, কোনো নারীই আর বিশ্বাস-যোগ্য নয় তার কাছে। লিজির থেকে দূরে থাকবে বলেই কারি-পরিবারের নৈশভোজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে সে। তাছাড়া এক প্রবঞ্চককে গ্রেপ্তার করার দায়িত্বও রয়েছে তার—খবর এসেছে সে নাকি পি্ পয়েন্টের দিকেই এসেছে। এই পরি-ব্যাপ্ত শুষ্কতা-বন্ধ্যাত্ব-কাঠিন্য আর সংশয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বারিষওয়ালা কেবলই আশার কথা বলে—বিশ্বাসের কথা বলে। কিন্তু বৃষ্টি আসে না।

বৃষ্টি আসে না বটে, তবে বারিষওয়ালা জিমিকে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে সাহায্য করে। লিজির মনে এনে দেয় বিশ্বাস, লিজি অবশেষে নারীত্বের লাবণ্য খুঁজে পায় নিজেরই মধ্যে। আর তখনই ফাইল এসে গ্রেফতার করে বারিষওয়ালাকে —এই সেই প্রবঞ্চক যার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। কিন্তু গোটা পরিবারের সমবেত অনুরোধে, বিশেষত লিজির অনুরোধে, ফাইল্ তাকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। ফাইলের কাঠিন্যের বর্ম-ভেদ করে প্রকাশ পায়

এতাবৎ অনুচ্চারিত লিজির প্রতি প্রেম। স্বপ্নের সদাগর যেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। অবরোধ-মুক্ত প্রেমে সিঞ্চিত হয় এক যুগল মানুষ মানুষী। আর তখনই আকাশ-ভরা বিদ্যুৎ-ঝলক আর কান-ফাটানো বজ্রপাত নিয়ে নামে মুষলধারে বৃষ্টি।

প্রিস্টলির নাটকের ইন্‌স্‌পেক্টরের মতোই ন্যাশের নাটকের "রেইনমেকার" এক রহস্যের কুহেলিকা ঘেরা চরিত্র। তারা যে কোথা থেকে এসে পড়ে আবার কোথায় চলে যায়—কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ন্যাশ-এর নাটকের কাব্যময়তা ও গভীরতা প্রিস্টলিতে নেই। আবার প্রিস্টলির নাটকের চরিত্রদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিবেকের তাড়না তো ন্যাশের বিষয়ের আওতার বাইরে।

"বারিষওয়ালা"র মঞ্চসজ্জা, আলোক-পরিকল্পনা, পোশাক, রঙ্গবস্তু—সবই বাস্তববাদী নাট্যের ধরনে এবং খুবই সুপরিকল্পিত আর দক্ষতার ব্যবহার। বিশেষত, মঞ্চসজ্জা এবং আলোক-পরিকল্পনা অত্যন্ত উঁচুমানের। অভিনয় এই প্রযোজনার অন্যতম সম্পদ। বিশেষত এইচ. সি. কারি ও লিজি কারি'র ভূমিকায় যথাক্রমে রাজারাম যাজ্ঞিক ও সঞ্চয়িতা ভট্টাচার্যের অভিনয় তো খুবই ভালো। কিন্তু, অভিনয়ের ধরন সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন থেকে যায় মনে।

নাটকটি ভাষান্তরিত হয়ে প্রযোজিত হয়েছে, চরিত্রগুলি সবই বিদেশী—তাদের পোশাক, সাজসজ্জা, বাড়ি-ঘর সবেতেই 'বিদেশী' ভাব বজায় রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র ভাষাটাই এদেশী। এমন ক্ষেত্রে অভিনয়ের ধরনটা কী হওয়া উচিত? কথাবার্তার ধরন-ধারন আচার-আচরণ কি হবে ভারতীয় হিন্দিভাষীদের মতো? নাকি, সেক্ষেত্রেও 'বিদেশী'-ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে? একমাত্র রাজারাম যাজ্ঞিকের অভিনয়ের নির্মিতিতে যেন সংযত অভিনয়ের এক সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অন্যেরা সকলেই এমন এক উচ্চকিত ধাঁচের অভিনয় করেন যে এক-দিকে বারিষওয়ালা চরিত্রটির রহস্যময়তা আর অন্য-দিকে নাটকটির কাব্যময়তা নাটকের স্তর ছাড়িয়ে নাট্যের স্তরে পৌঁছায় না কখনোই। শুধুমাত্র বারিষওয়ালা চরিত্রে অরুণ শর্মার অতি দুর্বল অভিনয়কেই তার জন্য দায়ী করা যাবে কি? অভিনয়ের সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যেই তো ছিল না বিষয়ের বিভিন্ন স্তরগুলি স্পর্শ করার কোনো সচেতন প্রয়াস।

তবু "বারিষওয়ালা" নাট্যমেলার সবচাইতে সু-অভিনীত, সু-প্রযোজিত নাটক। দর্শকদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ যোগ্য ক্ষেত্রেই বর্ষিত হয়েছে। নাট্যচর্চা প্রসঙ্গে দুটি খুব পুরোনো সত্য আবার নতুন করে যেন প্রমাণিত হল এবারের নাট্যমেলায়। এক, নাট্যে অভিনয়ই আসল, দর্শক ভালো অভিনয় দেখতে চান, আর দুই, ভালো নাটকের একটা নিজস্ব জোর থাকে যার সাহায্যে দুর্বল প্রযোজনাও খানিক ত'রে যেতে পারে। আশা করা যাক, 'ভালো নাটক ভালো করে করব' প্রবাদক্রম এই প্রতিজ্ঞাটিকে এরপর আর তেমন হাস্যকর কথা ব'লে মনে হবে না কিছু মানুষের।

এই আলোচনার গোড়ার দিকে নাট্যমেলার দর্শকদের নৈরাশ্য আর ক্লান্তির প্রশ্নে বলেছিলাম গুটি কয়েক কথা দর্শক এবং উদ্যোক্তা উভয় তরফেই ভেবে দেখার আছে। তারপরে ভোক্তাদের জ্ঞাতব্য এবং বিবেচনীয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছিলাম। এবারে উদ্যোক্তাদের তরফে ভেবে দেখার কথায় আসা যেতে পারে। এই সাত বছর ধরে "নান্দীকার" অশেষ উদ্যম, শ্রম আর অর্থ ব্যয়ে আমাদের পরিচিত করেছেন মোটের উপরে সাম্প্রতিক ভারতীয় নাট্য-চর্চা ও নাট্যচিন্তার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে। আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে ভিড় করে এসেছি বিভিন্ন প্রদেশের নাট্যকর্ম দেখার জন্য। দেখেছি এবং প্রাথমিক এক হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে অনেকেই ভেবেছি—'আমরা কি করছি! যেমনটা ওঁরা করছেন তেমনটা তো কোনোদিন পারবো না করতে।'

আমাদের সেই হীনম্মন্যতাকে প্রগাঢ় করে তুলেছে স্থানীয় সমালোচকদের তিরস্কার। 'সামগ্রিক নাট্য' বা 'টোটাল থিয়েটার' নাকি এই এবং তা আমাদের অধিগত নয়—এই ছিল সেই তিরস্কারের মূল কথা।

হীনম্মন্যতার প্রাথমিক সেই ধাক্কা কেটে গেলে ধীরে-ধীরে বুঝতে পেরেছি অন্যান্য প্রাদেশিক নাটক থেকে প্রাপ্তির ঘরে জমার অঙ্ক সত্যি ততোটা নয়। আর তার পরে নৈরাশ্য, ক্লান্তি, বিরক্তি এবং ক্ষোভ বড়ো তাড়াতাড়ি জড়ো করে তুলেছি প্রথমদিকের এই হীনম্মন্যতাকেই প্রাণপণে অস্বীকার করার জন্য। ওই গোড়ার আর এই শেষের—কোনো প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই বিচক্ষণতা নেই। এই বিচক্ষণতাহীনতা ইতিহাস-অজ্ঞতা এবং ঐতিহ্য-চেতনার অভাবজনিত। অন্যে না বলে দিলে নিজের মতো করে বোঝার ক্ষমতাটা আমাদের নেই—ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব না থাকলে যা হয়। ফলে হীনম্মন্যতা থেকে আত্মস্তরিতার মাঝখানে দুলেই যেতে হয় অবিরত।

তাই, "নান্দীকার"কে অনুরোধ ভেবে দেখার। এই সাত বছরে নাট্যচর্চা যেমন চলছে এই দেশটাতে তা আমরা দেখে নিয়েছি, দেখেছি এত ভঙ্গ তবু আমার দেশ কত রঙ্গে ভরা। এই সাতটা বছর গণ্য হোক "জাতীয় নাট্যমেলা"র প্রথম পর্ব হিসেবে। এবারে শুরু হোক তার দ্বিতীয় পর্ব। রূপ-আরোপের পর্ব চুকিয়ে স্বরূপ-সন্ধানের পর্ব শুরু হোক। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই খানিকটা শিক্ষা হয়েছে। এবার বুঝে নিতে চেষ্টা করি ভারতীয় থিয়েটারের আত্মাটিকে। আমাদের নাট্যচর্চার মধ্য দিয়েই চলুক সেই সন্ধান এবং সেই মান অনুযায়ী বাছাই করা হোক অন্যান্য প্রদেশের নাট্যকর্ম। দ্বিতীয় পর্বের সেই নাট্যোৎসবের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকব আমরা আগামী একটি বছর।

[এবারের জাতীয় নাট্যমেলায় পরিবেশিত অন্যান্য নাটকগুলি সম্পর্কেও লেখিকা তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। স্থানাভাবশত ছাপতে পারলাম না বলে আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক চতুরঙ্গ]

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী', ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।